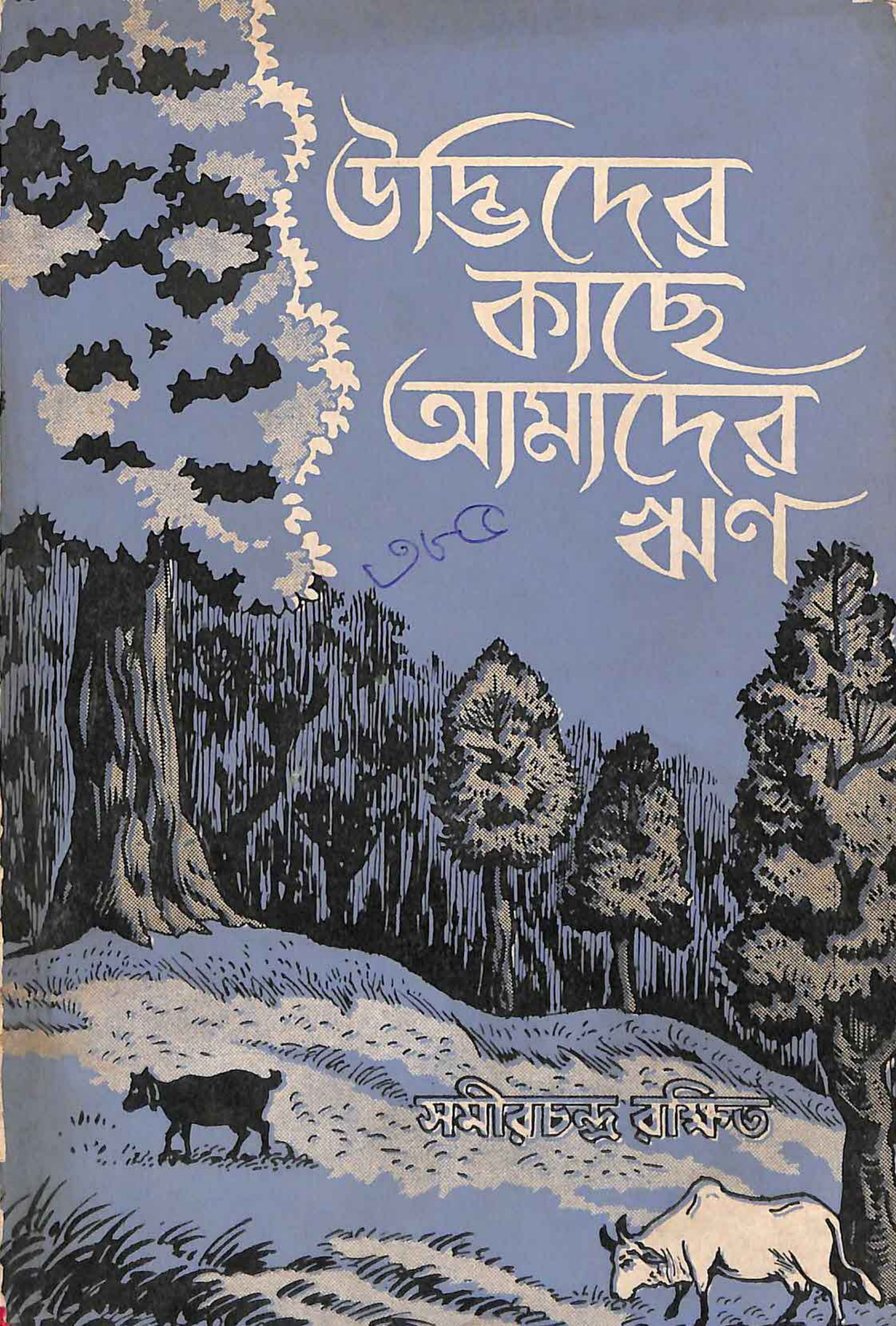

উদ্ভিদের
কাছে
আমাদের
ঋণ
সমীরচন্দ্র রক্ষিত

উদ্ভিদের কাছে আমাদের ঋণ

ডঃ সমীর চন্দ্র রক্ষিত
বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী

শরৎ বুক হাউস
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

বিজ্ঞান-কথা সংগ্রহ ঃ ৪

প্রকাশ ঃ মহালয়া, ১৩৯২ সন

প্রকাশক ঃ গৌতম রক্ষিত
১০/৩, সেন্ট্রাল পার্ক
কলিকাতা ৭০০ ০৩২

মুদ্রাকর ঃ বেঙ্গল জব প্রেস,
১/৫/১এ, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০১২

বাঁধাই ঃ শ্রী বিজয় দে
শ্রী গৌরাঙ্গ বাইন্ডিং ওয়ার্কস, ৩/১এ, পাটোয়ার বাগান লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

মূল্য ঃ দশ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

এই বইটির প্রকাশনার ব্যাপারে অধ্যাপক ডঃ সন্তোষ কুমার মাজী প্রচুর সাহায্য করেছেন। তার সক্রিয় সহযোগিতার জন্যই বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হল। তাকে আমার অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

—গ্রন্থকার

উদ্ভিদের কাছে আমাদের ঋণ

মানুষ তার উন্নত মস্তিষ্কের সাহায্যে আর বুদ্ধির সুনিপুণ প্রয়োগে সমস্ত প্রাণীর উপর আধিপত্য স্থাপন করতে পেরেছে। মানুষ আগুন জ্বালাতে পারে, নিজেই খাদ্য তৈরী করে নিতে পারে, নিজের পরিধেয় তৈরী করতে পারে, আশ্রয় বানাতে পারে, নানারকম যন্ত্র তৈরী করে নিজের সুখ-সুবিধা বাড়াতে পারে, প্রকৃতির শক্তিকে ইচ্ছে মত কাজে লাগাতে পারে। অন্যান্য প্রাণীর এসব ক্ষমতা নেই। তাই প্রাণিজগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ।

কিন্তু সেই মানুষকেই আবার তার প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত মাথা খুঁড়তে হয় উদ্ভিদের কাছে। উদ্ভিদের সাহায্য ছাড়া তার চলে না; উদ্ভিদের কাছে মানুষের ঋণের সীমা নেই। শুধু মানুষ নয়, সমস্ত প্রাণিজগতই উদ্ভিদের কাছে ঋণী। এককোষী প্লাংকটন, ডাই-অ্যাটম থেকে শুরু করে বিশাল সব মহীরুহ পর্যন্ত সমস্ত উদ্ভিদ নিরন্তর নানাভাবে আমাদের সাহায্য করে চলেছে। উদ্ভিদের কাছে আমাদের ঋণের কথা ভাবলে প্রথমেই মনে আসে সালোক-সংশ্লেষের কথা।

॥ ১ ॥ সালোক-সংশ্লেষ

শিকড় মাটি থেকে জল সংগ্রহ করে উদ্ভিদের সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়; গাছের পাতার কোষেও সেই জল এসে পৌঁছয়। আবার বাতাসের কার্বন-ডাই অক্সাইডকে পাতার কোষ অসংখ্য সূক্ষ্ম রন্ধ্রপথ (stoma) দিয়ে ভিতরে টেনে নেয়। পাতার কোষে কোষে রয়েছে প্রচুর কণা যার নাম ক্লোরোপ্লাস্ট (chloroplast)। এই ক্লোরোপ্লাস্ট কণার মধ্যে সবুজ ক্লোরোফিল অণু থাকে। প্রতিটি কণাতে কয়েক শ' কোটি ক্লোরোফিল অণু থাকে। সবুজ ক্লোরোফিল সূর্যের আলোর খানিকটা শোষণ করে এবং তার সাহায্যে জল এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইডের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে শর্করা জাতীয় বস্তু তৈরী করে। এই প্রক্রিয়ার নামই "সালোক-সংশ্লেষ। রবিরশ্মির সাহায্যে এটা হয় তাই এই নাম। ক্লোরোফিলের কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় না, সে শুধু আলোর রশ্মির শোষণে সাহায্য করে; বস্তুতঃ ক্লোরোফিল অনুঘটক মাত্র।

এই সালোক-সংশ্লেষের কথা এখন সবাই জানে।

সালোক-সংশ্লেষ জাত শর্করাই সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের খাদ্যের মূল উৎস। পাতার কোষ থেকে শর্করা গাছের নানা অঙ্গে পরিবাহিত হয়। এই শর্করাই বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে স্টার্চ, সেলুলোজ, ফ্যাট বা তৈলজাতীয় পদার্থ তৈরী করে। উদ্ভিদ আবার মাটি থেকে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ঘটিত নানা পদার্থ সংগ্রহ করে। সেইসব যৌগের সঙ্গে বিভিন্ন অবস্থায় শর্করার ক্রিয়ার ফলে প্রোটিন, ভাইটামিন ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। এই শর্করা জাতীয় উপাদান থেকেই গাছের বৃদ্ধি হয় এবং তার ডালপালা, শিকড়, ফুল, ফল, বীজ ইত্যাদি তৈরী হয়। মূলে এই শর্করা না থাকলে অন্যান্য একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তুও হত না। কখনও সরাসরি উদ্ভিদ থেকে আবার কখনও উদ্ভিদপুষ্ট নিম্নতম প্রাণীর মাধ্যমে মানুষ তার নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে। জীবজগতের খাদ্যের মূল উৎসই হল সালোক-সংশ্লেষ থেকে উদ্ভূত শর্করা, সেটার অভাবে জীবজগতের অস্তিত্বই লোপ পাবে। সাগরের বুকে প্রথম যে প্রাণের প্রসার ঘটেছিল সেটাও এই সালোক-সংশ্লেষের অনুগ্রহেই।

সালোক-সংশ্লেষে শর্করা উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেনও উপজাত হয় এবং সেই অক্সিজেন কোষ থেকে বেরিয়ে বাতাসে মিশে যায়। যত আয়তন কার্বন-ডাইঅক্সাইড সালোক-সংশ্লেষে অপসারিত হয় তার সম-আয়তন অক্সিজেন বাতাসে চলে আসে। রসায়নবিদরা তাদের সংকেতের সাহায্যে সালোক-সংশ্লেষ বিক্রিয়াটিকে লেখেন ঃ—

$$n\,CO_2 + n\,H_2O + n^{\prime}\,h\nu \xrightarrow{\text{ক্লোরোফিল}} (CH_2O)_n + nO_2$$

কার্বন-ডাই-অক্সাইড   জল   আলোক শক্তি   শর্করা   অক্সিজেন

বাতাস থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের অপসারণ এবং তার বদলে অক্সিজেনের উৎপাদন এক নিত্য ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় ঘটনা। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসই প্রাণের লক্ষণ, আর তার জন্য চাই অক্সিজেন। এই অক্সিজেনের যোগান দেয় সালোক-সংশ্লেষ। কাঠ, কয়লা প্রভৃতি যখন পোড়ে তখন এদের দহনের ফলে যথেষ্ট তাপ এবং কিছু আলোর উৎপাদন হয়। দাহ্যবস্তু কাঠ ইত্যাদি জারিত হয়ে জল এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। দেহের ভিতরেও শর্করা প্রভৃতির এরকম দহন তথা জারণ হয় এবং জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। প্রশ্বাসের সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেন রক্তকণিকার সাহায্যে দেহের কোষে

গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে খানিকটা শর্করাকে যথা গ্লুকোজকে ($C_6H_{12}O_6$) জারিত করে। জল ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ শ্বসন-ক্রিয়াটি সালোক-সংশ্লেষের ঠিক বিপরীত। তবে এই জারণের জন্য আলোকশক্তির দরকার হয় না কিন্তু প্রচুর তাপশক্তির উদ্ভব হয়। এই জারণ-ক্রিয়াটিকে লেখা যায় :—

$$\underset{\text{গ্লুকোজ-শর্করা}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{6O_2} \longrightarrow \underset{\text{কার্বন-ডাই অক্সাইড}}{6CO_2} + \underset{\text{জল}}{6H_2O} + \underset{\text{তাপশক্তি}}{Q}$$

জীবদেহের প্রতি কোষে কোষে নিরন্তর এই দহন-ক্রিয়া ঘটে চলেছে। খাদ্যবস্তুর দহন থেকে উৎপন্ন তাপই আমাদের দেহের উষ্ণতা রক্ষা করে এবং আমাদের কর্মশক্তির যোগান দেয়।

শর্করা সৃষ্টি এবং অক্সিজেন উৎপাদন ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সালোক-সংশ্লেষ থেকে সাধিত হয়। এই সংশ্লেষে খানিকটা সূর্যালোক শোষিত হয়। আলো এক রকমের শক্তি। সালোক-সংশ্লেষের ফলে খানিকটা সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে শর্করার মধ্যে বিধৃত হয়ে পড়ে। পৃথিবীর বুকে যতটা সৌরশক্তি পতিত হয় তার প্রায় ৮ শতাংশ সালোক-সংশ্লেষ বেঁধে রাখতে পারে। এই শক্তিই সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের জীবনধারণের শক্তির যোগান দেয়। বনে-জঙ্গলে, শস্যক্ষেত্রে, দূর্বাদলে, শৈবালগুচ্ছে যতক্ষণ সূর্যালোক রয়েছে ততক্ষণ সর্বত্র অলক্ষ্যে নিঃশব্দে এই শক্তি-আহরণ চলছে। শর্করা তথা অন্যান্য খাদ্যবস্তুতে যে শক্তি এভাবে থাকে সেটাই এসে আমাদের পেশীর শক্তির উৎস হয়েছে; আমাদের জীবনধারণ সম্ভব হয়েছে। এই শক্তির সাহায্যেই আমরা চলাফেরা করি, কথা বলি, কাজ করি, চিন্তা করি, ফসল কাটি। কাজ করার সময় কোষে কোষে শর্করার জারণ প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। সাধারণভাবে আলোকশক্তিকে তাপশক্তি বা যান্ত্রিকশক্তিতে রূপান্তরিত করা মোটেই সহজ নয়। কিন্তু প্রকৃতির এই সালোক-সংশ্লেষে অবলীলাক্রমে নিরন্তর এই রূপান্তর হচ্ছে; সৌরশক্তি থেকেই আমরা আমাদের কর্মশক্তি পাচ্ছি।

শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য প্রতি মুহূর্তে আমাদের অক্সিজেন প্রয়োজন। আজ যদি সালোক-সংশ্লেষ বন্ধ হয়ে যায় তবে অল্পকালের মধ্যেই বাতাসের আনুমানিক ২০ শতাংশ অক্সিজেন নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং জীবজগত লোপ পাবে। শুধু তাই নয়, নিঃশ্বাসের ফলে বাতাসে যে প্রচুর কার্বন-ডাইঅক্সাইড তৈরী হবে তার অপসারণ হবে না এবং বায়ু দূষিত হয়ে জীবনের পক্ষে অনুপযোগী

হবে। সৃষ্টিকর্তা এক পরম বিজ্ঞানী ; তিনি অক্সিজেনের উৎপাদন এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইডের অপসারণের মধ্যে এক সমতা রেখে দিয়েছেন, সালোক-সংশ্লেষের মাধ্যমে যাতে জীবজগতের জীবনধারা অটুট থাকে। অতএব সালোক-সংশ্লেষ খাদ্য উৎপাদন করে, সৌরশক্তিকে শোষণ করে আমাদের কর্মশক্তি যোগায়, অক্সিজেন উৎপাদন করে প্রাণের স্পন্দন রক্ষা করে, কার্বন-ডাইঅক্সাইডকে অপসৃত করে। উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ থেকেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সমস্ত জৈব পদার্থের উদ্ভব আর সেই জৈব পদার্থের সাহায্যেই জীবজগত বেঁচে আছে।

পাতার কোষের ক্লোরোপ্লাস্ট কণাগুলিতে যে অসংখ্য ক্লোরোফিল অণু রয়েছে সেগুলিই সালোক-সংশ্লেষে পৌরহিত্য করে। ক্লোরোফিল ম্যাগনেসিয়াম যুক্ত অতি জটিল অণু। বস্তুতঃ একাধিক রকমের ক্লোরোফিল থাকে। প্রধান দুইটির নাম করা যেতে পারে : ১) নীলাভ-সবুজ ক্লোরোফিল-a এবং ২) পীত-সবুজ ক্লোরোফিল-b। এরা যে জটিল অণু সেটা এদের সংকেত থেকেই বোঝা যায়। ক্লোরোফিল-a হচ্ছে $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$ এবং ক্লোরোফিল-b, $C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$। দু'রকম ক্লোরোফিলই সূর্যালোক শোষণ করতে পারে। সাতরঙা সূর্যালোকে (Vibgyor) অসংখ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো রয়েছে ; এর অতি সামান্য অংশ ক্লোরোফিল শোষণ করতে সক্ষম। লাল এবং গাঢ় নীল আলোতরঙ্গকে ক্লোরোফিল শোষণ করে ; এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $651 \sim 688 m\mu$ এবং $410 \sim 500 m\mu$-এর মধ্যে। [$1 m\mu = 10^{-7}$ সেমি]। এরা সবুজ আলো শোষণ করে না। ক্লোরোফিল-a সর্বাধিক শোষণ করে $429\ m\mu$ এবং $660\ m\mu$ তরঙ্গ। আর ক্লোরোফিল-b সবচেয়ে বেশী শোষণ করে $453\ m\mu$ এবং $642\ m\mu$-তে।

সৌরশক্তি শোষণ করে ক্লোরোফিল অণু উত্তেজিত (energised) হয়ে ওঠে। ক্লোরোফিল-a সঙ্গে সঙ্গেই, আনুমানিক $১০^{-৯}$ সেকেণ্ডের মধ্যেই, শোষিত শক্তি দিয়ে জল ও কার্বন-ডাইঅক্সাইডের মধ্যে বিক্রিয়াটিকে আরম্ভ করে দেয়। ক্লোরোফিল-b অণুও সূর্যালোক শোষণ করে তবে সে সরাসরি কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলের বিক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে না। আলো শোষণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লোরোফিল-b সেই শক্তিটুকুকে সংস্পন্দনের (resonance) মাধ্যমে ক্লোরোফিল-a-কে চালান করে দেয়। সেই শক্তি পেয়ে ক্লোরোফিল-a আরো বেশী সালোক-সংশ্লেষ করতে পারে। ক্লোরোফিল অণুগুলো আহৃত সৌরশক্তিকে বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। $১০^{-৮}$ সেকেণ্ড

সময় অতিক্রম করলে ক্লোরোফিল যে শক্তি পেয়েছিল সেটা কোন আলো বা তাপের তরঙ্গাকারে বেরিয়ে চলে যায়।

ক্লোরোফিল-a আহৃত সৌরশক্তি পেয়ে যখন উত্তেজিত অবস্থায় থাকে তখন সেটা সন্নিহিত জলের অণুকে আক্রমণ করে। জলের অণুকে ভেঙে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন আয়ন এবং ইলেকট্রনে রূপান্তরিত করে।

$$2\,H_2O \longrightarrow 4H^+ + O_2 + 4e$$

অক্সিজেন কোষ থেকে বেরিয়ে এসে বাতাসে মেশে। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অপরিহার্য অক্সিজেন আসে জলের থেকে, কার্বন-ডাইঅক্সাইড থেকে নয়। ক্লোরোপ্লাস্টে নানা বস্তুর মধ্যে বিশেষ এক ধরনের অণু রয়েছে তার নাম ফেরোডক্সিন (**ferrodoxin**)। এর একটি কাজ হচ্ছে ইলেকট্রনগুলিকে টেনে নেওয়া। উৎপন্ন হাইড্রোজেন আয়ন কার্বন-ডাইঅক্সাইডকে বিজারিত করে তাকে প্রথমে ফরম্যালডিহাইডে (HCHO) পরিণত করে। তারপর এই ফরম্যালডিহাইড থেকে বহুযোজনের (polymerisation) ফলে শর্করা জাতীয় পদার্থের (carbohydrates) সৃষ্টি হয়।

$$CO_2 + 4H \rightarrow H_2O + HCHO\ ;\ n\,HCHO \rightarrow (HCHO)_n\ (\text{শর্করা})$$

কার্বন-ডাইঅক্সাইডের বিজারণে ফরম্যালডিহাইড হয়—এ কথাটি যত সহজে বলা হল ব্যাপারটি মোটেই তত সহজ নয়। কার্বন-ডাইঅক্সাইড থেকে ফরম্যালডিহাইডে পরিণতি অনেকগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে বা ক্ষেপে সংঘটিত হয়। এসকল বিভিন্ন স্তরের বিক্রিয়ার জন্য অন্যূন নয় রকম এনজাইম প্রয়োজন হয়। নানা প্রকারের এনজাইম ছাড়াও আরও দুইটি পদার্থ একান্ত দরকার। ১) অঘটন-ঘটনপটিয়সী **ATP** [adenosine triphosphate] এটি শক্তি-সংবাহক। এটি বিভিন্ন অণুর মধ্যে শক্তি বহন করে নিয়ে প্রয়োজনীয় বিক্রিয়াতে সাহায্য করে। ২) দ্বিতীয়টি হল **NADP (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate)** যেটা জারণ-বিজারণ দ্বারা রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত করিয়ে দেয়। এই দুইটি পদার্থই জীবন্ত কোষে সর্বদা রয়েছে।

উদ্ভিদ এবং প্রাণীর সমস্ত জীবন্ত কোষেই সর্বক্ষণ নানা রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে। এই সব বিক্রিয়াকে বলা হয় কোষের 'বিপাক ক্রিয়া' বা মেটাবলিজম (metabolism)। প্রকৃত পক্ষে দুইটি বিপরীত ধরনের পরিবর্তন সর্বদা ঘটছে। একদিকে, কোষের মধ্যে নানা জটিল বস্তু স্টার্চ, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ইত্যাদি নিরন্তর ভেঙে ভেঙে সরল ও

সরলতর পদার্থে পরিণত হচ্ছে। প্রোটিন থেকে অ্যামিনো-এ্যাসিড, স্টার্চ থেকে চিনি, চিনি থেকে কোহল, কোহল থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জল তৈরী হচ্ছে। কোষের ভিতরের জটিল অণুর এরকম বিভাজনকে বলা হয় অপচিতি বা ক্যাটাবলিজম (catabolism)। এরকম বিভাজন ক্রিয়া থেকে প্রচুর তাপ শক্তি উৎসারিত হয়।

অপরদিকে, সরল অণু থেকে কোষের অভ্যন্তরে বিশালাকার জটিল সব অণুর সৃষ্টি হচ্ছে। জল ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড থেকে গ্লুকোজ তৈরী হচ্ছে। আবার গ্লুকোজ অণু পরস্পরের সঙ্গে সংহত হয়ে অথবা অন্যান্য অণুর সঙ্গে মিলে জটিল স্টার্চ, ফ্যাট, প্রোটিন ইত্যাদিতে পরিণত হচ্ছে। এর নাম 'উপচিতি' বা অ্যানাবলিজম (anabolism)। এই রকম বড় বড় জটিল অণুর সংশ্লেষণে সর্বদা বাইরে থেকে শক্তি-সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। ক্যাটাবলিজম থেকে উদ্ভূত শক্তির খানিকটা এই কাজে ব্যবহৃত হয়। সালোক-সংশ্লেষে ত সৌরশক্তিই ব্যবহৃত হয়।

কোষের মধ্যে এই সব বিচিত্র রূপান্তর অনায়াসে স্বাভাবিকভাবে ঘটে, কিন্তু এই বিক্রিয়াগুলিকে কোষের বাইরে টেস্টটিউবে করা খুবই কষ্টকর এবং অনেক সময় দুঃসাধ্য। যেমন কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জল থেকে গ্লুকোজ তৈরী করা অথবা গ্লুকোজকে স্টার্চে পরিণত করা খুবই কষ্টসাধ্য। কোষের মধ্যে এসব বিক্রিয়া এত সহজে হওয়ার কারণ, সেখানে স্বভাবজাত নানারকমের জৈব অনুঘটক রয়েছে যাদের সান্নিধ্যে ও সহযোগিতায় এসব পরিবর্তন অবলীলাক্রমে ঘটে। এই অনুঘটকগুলি হল "এনজাইম" যদিও এনজাইমগুলো কোষের প্রাণবস্তু প্রোটোপ্লাজম থেকে তৈরী হয়, কিন্তু এরা প্রাণশীল নয়। এরা অত্যন্ত জটিল প্রোটিন সম্ভূত রাসায়নিক পদার্থ। জীবজগতের নানা কোষে প্রয়োজন অনুযায়ী হাজারো রকমের এনজাইম রয়েছে। প্রতিটি বিক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট এনজাইমের প্রয়োজন হয়। অ্যামাইলেস এনজাইম শুধু স্টার্চকে গ্লুকোজে পরিণত করতে সাহায্য করে কিন্তু গ্লুকোজকে কোহলে পরিণত করতে অক্ষম। গ্লুকোজ থেকে কোহল পেতে হলে জাইমেস এনজাইম প্রয়োজন। এই কারণে বিভিন্ন কোষে নানাপ্রকার বিক্রিয়ার জন্য শত শত রকমের এনজাইম দেখা যায়। আগেই বলা হয়েছে, সালোক-সংশ্লেষে শর্করা উৎপাদনে অনেকগুলো স্তর পেরিয়ে আসতে হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট এনজাইমের সাহায্য প্রয়োজন হয়। সংশ্লেষণের মত খাদ্য বস্তুর দহনে তথা শক্তি উৎপাদনেও নানারকম এনজাইম অংশ নেয়।

ক্লোরোফিল-b ছাড়া আরও দুইরকম রঞ্জকবস্তু (pigment) কোন কোন কোষে রয়েছে যেগুলো সূর্যের আলো সংগ্রহ করে সালোক-সংশ্লেষে সাহায্য করে। এরা হল,—১) ক্যারোটিনয়েড (carotenoids) এবং ২) ফাইকো-বিলিন (phycobilins)। ক্যারোটিন নানারকমের হয়, টমেটো বা লাল লংকার বর্ণ এরূপ একটি ক্যারোটিনের (lycopene) জন্য। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের নানা কোষেই ক্যারোটিন রয়েছে। পাতার কোষের হলদে কমলা রংয়ের ক্যারোটিন সূর্যের নীলাভ তরঙ্গ (425 ~ 475 mμ) শোষণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেই শক্তিটুকু ক্লোরোফিল-a কে দিয়ে দেয় এবং তার সাহায্যে সালোক-সংশ্লেষ ঘটে। সবুজ শৈবাল বা অ্যালজীতেও ক্যারোটিনের মাধ্যমে এরূপে সালোক-সংশ্লেষ হয়। কোন কোন নীল-সবুজ এবং লাল শৈবালের কোষে ফাইকোবিলিন রঞ্জক থাকে, অন্য উদ্ভিদে নেই। এরা কমলা ও সবুজ আলো (540 ~ 565 mμ এবং 560 ~ 615 mμ) শোষণ করে এবং ক্লোরোফিল b-এর মত শোষিত সৌরশক্তিকে ক্লোরোফিল-a কে দিয়ে দেয়, সালোক-সংশ্লেষের উদ্দেশ্যে।

সালোক-সংশ্লেষে উদ্ভিদ বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইডের কার্বনকে বন্দী করে শর্করায় পরিণত করে। এই শর্করাই আমদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জৈব পদার্থের মূল উৎস। একে "কার্বন-বন্ধন" বলা যেতে পারে। এই শর্করার খানিকটা কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে জারিত হয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইরূপে বাতাসে ফিরে আসে। কি পরিমাণে বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্ভিদে কার্বন-বন্ধন হয় তার একটা মোটামুটি হিসাব করা হয়েছে।

উদ্ভিদের বার্ষিক কার্বন-বন্ধন

উদ্ভিদ অঞ্চল	অঞ্চলের আয়তন (কিমি)^২	কার্বন-বন্ধন কেজি/বৎসর
ভূখণ্ডে :		
বনজঙ্গলে	৪৪×১০^৬	৬২×১০^{১২}
আবাদী জমিতে	২৩×১০^৬	২১×১০^{১২}
অনাবাদী ও ঘাস জমিতে	২৭×১০^৬	২৫×১০^{১২}
তুষার ও তুন্দ্রা-অঞ্চলে	২২×১০^৬	০.৫×১০^{১২}
মরু অঞ্চলে	৩৩×১০^৬	১.৫×১০^{১২}
	১৪৯×১০^৬	১১০×১০^{১২}

বারিমণ্ডলে ঃ

হ্রদ, নদী, ইত্যাদি	0.2×10^{6}	0.02×10^{12}
সাগর, মহাসাগরে	361×10^{6}	29.3×10^{12}
	361.2×10^{6}	29.32×10^{12}

অর্থাৎ পৃথিবীতে সালোক-সংশ্লেষে বছরে মোট কার্বন-বন্ধন= 139.32×10^{12} কেজি। যে জৈব পদার্থটুকু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে জারিত হয়ে চলে যায় সেটা বাদ দিয়েই এই হিসাবটি করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এভাবে প্রতিক্ষণে যতটা কার্বন-বন্ধন হয় তার সম-পরিমাণ কার্বন অপচিতি ক্রিয়ার ফলে অক্সাইডরূপে ফিরে আসে।

পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় সত্তর শতাংশ জলে ঢাকা, সেখানে সালোক-সংশ্লেষ হচ্ছে মোটের মাত্র ২০ শতাংশ। এর প্রায় সবটুকুই সমুদ্রের শৈবাল-কোষেই হয়। বেশীর ভাগ (৮০%) সালোক-সংশ্লেষ অর্থাৎ শর্করা-উৎপাদন ঘটে স্থলজ গাছ পালাতে, সর্বাধিক বন-জঙ্গলে। বনজঙ্গল স্থল-ভূমির এক তৃতীয়াংশ হলেও শর্করা-উৎপাদন করে ৫০ শতাংশ। সব বনভূমিতে অবশ্য একরকম উৎপাদন হয় না। যে সব গাছের পাতা শীতের সময় ঝরে যায়, মাত্র ৬/৭ মাস পাতা থাকে, সেখানে দেখা যায় গড়ে বছরে প্রতি বর্গমিটারে ০.৫৪ কিগ্রা কার্বন-বন্ধন হয়। পাইন প্রভৃতি চির সবুজ গাছের ক্ষেত্রে প্রতি বছরে এক বর্গমিটারে ১.৪০ কিগ্রা কার্বন-বন্ধন হয়। আবার বিষুবাঞ্চলে সেটা বেড়ে গিয়ে ২.৪ কিগ্রা হয় প্রতি বর্গমিটারে। সূর্যালোক কতক্ষণ পাওয়া যাবে, জলের পরিবহন কিরূপ, সৌর রশ্মির তীব্রতা কত, এসবের প্রভাব রয়েছে সালোক-সংশ্লেষের পরিমাণের উপরে। বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইড আছে ০.০৩ শতাংশ। নির্দিষ্ট সূর্যালোকে উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধিতে সালোক-সংশ্লেষের পরিমাণ একই থাকে। তাপমাত্রার এমনি বিশেষ কোন প্রভাব নেই তবে অতি শীতল অবস্থায় এনজাইমের কার্যকারিতা কমে যায় তাই শর্করা-উৎপাদন হ্রাস পায়। মরু অঞ্চলে জলের অভাবের জন্য সালোক-সংশ্লেষ সামান্যই হতে পারে। বাতাসের দূষণের জন্য সালোক-সংশ্লেষ বিঘ্নিত হয়। বাতাসে যদি নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার-ডাইঅক্সাইড, ওজোন প্রভৃতি থাকে তবে সেই সব গ্যাস রন্ধ্রপথ দিয়ে পাতার কোষে প্রবেশ করে সালোক-সংশ্লেষণ বন্ধ করে দেয় ; অনেক সময় কোষটিকেও নষ্ট করে দেয়।

॥ ২ ॥

উদ্ভিদ থেকে খাদ্য

মানুষ এবং অন্য সব প্রাণীরই বেঁচে থাকতে হলে খাদ্য চাই। খাদ্য থেকে আসে পুষ্টি এবং শক্তি ; স্বাস্থ্যও নির্ভর করে খাদ্যের উপরে। আমাদের খাদ্যের প্রধান যোগানদার উদ্ভিদ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির লোকেদের খাদ্য একরকম নয়। খানিকটা পার্থক্য আছে। প্রাগ্ ইতিহাসের কাল থেকেই ত মানুষ তার খাদ্যের জন্য প্রধানতঃ উদ্ভিদ্-নির্ভর। প্রস্তর যুগের মানুষ ত গাছের ফল, মূল, কন্দ এসব দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করত। কখনও কখনও পাথর দিয়ে ছোট ছোট প্রাণী হত্যা করে তার মাংস খেত। আজকের সভ্যতার যুগের মানুষও কিন্তু নানা উদ্ভিদের উপরেই তার খাদ্যের জন্য নির্ভর করছে। ভারত, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ইটালী, গ্রীস, মেক্সিকো, ব্রাজিল, আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে খাদ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ উদ্ভিদ আর বাকী ২০ শতাংশ প্রাণিজ খাদ্য, যেমন, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, পনীর, মাখন ইত্যাদি। কানাডা, গ্রেট-ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের অনেক দেশের খাদ্যে উদ্ভিজ্জ খাদ্য ৬০ শতাংশের বেশী নয় ; তাদের খাদ্যে মাংস, ডিম ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের পরিমাণ বেশী।

খাদ্যের মধ্যে প্রধানতঃ তিন রকম পদার্থ থাকতেই হবে ; সেগুলি হল — কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট আর প্রোটিন। এ ছাড়াও কিছু ভাইটামিন এবং কয়েকটি খনিজ মৌল লবণাকারে থাকা প্রয়োজন। শাকজীবী প্রাণী, যেমন, গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, হরিণ ইত্যাদি সরাসরি ঘাস, লতাপাতা থেকেই এসব খাদ্য-উপকরণ সংগ্রহ করে নেয়। মাংসাশী প্রাণীরা যেমন, বাঘ, সিংহ, কুকুর, বেড়াল প্রভৃতি নিম্নেতর বা অন্য প্রাণীর দেহ থেকে খাদ্য নেয়। অর্থাৎ এরাও খাদ্যের জন্য পরোক্ষে উদ্ভিদের উপরেই নির্ভর করে। মানুষের খাদ্যে অবশ্য উদ্ভিজ্জ এবং জান্তব দুইরকম পদার্থই থাকে।

কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার পদার্থ : কার্বোহাইড্রেট মাত্রেই কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। তবে সব

কার্বোহাইড্রেটেই হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের পরমাণুর অনুপাত সর্বদা ২ ঃ ১। বহু রকমের কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় পদার্থ উদ্ভিদ দেহে রয়েছে। এদের মধ্যে সব চেয়ে সরল যেগুলো তাদের বলা হয় মনোস্যাকারাইড। মনোস্যাকারাইডের অণুতে ছয়টি কার্বন পরমাণু সাধারণতঃ থাকে, এদের নাম হেক্সোজ। সংকেত $C_6H_{12}O_6$। পাঁচটি কার্বন-যুক্ত মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় পেন্টোজ, সংকেত $C_5H_{10}O_5$। একই সংকেতের অর্থাৎ সমাবয়বী (isomeric) অনেক হেক্সোজ ও পেন্টোজ আছে ঃ—

হেক্সোজ ($C_6H_{12}O_6$)→গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ম্যানোজ, গ্যালাক্টোজ…
পেন্টোজ ($C_5H_{10}O_5$)→অ্যারাবিনোজ, জাইলোজ, রাইবোজ,…

এসব সরল শর্করা উদ্ভিদ দেহের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এদের মধ্যে প্রধান সালোক-সংশ্লেষজাত গ্লুকোজ-জীবকোষে এর নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে। রাইবোজ-ডাইফসফেট পাতার কোষে থাকে কারণ রন্ধ্রপথে কার্বন-ডাইঅক্সাইড প্রবেশ করলে রাইবোজ ডাইফসফেটই তাকে প্রথম শোষণ করে নেয়।

অনেক সময়েই দুইটি হেক্সোজ বা পেন্টোজ অণু একত্র যুক্ত হওয়ার ফলে ডাইস্যাকারাইড কার্বোহাইড্রেটের সৃষ্টি হয়। যথা ঃ

গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ → সুক্রোজ (আখের চিনি)
গ্লুকোজ + গ্লুকোজ → মলটোজ
গ্লুকোজ + র‍্যামনোজ → রুটিনোজ (পুষ্পস্তবকে প্রায়ই থাকে)
(পেন্টোজ)

আমরা সর্বদা যে চিনি খাই সেটাই সুক্রোজ। আখ, বীট, নানা রকমের মিষ্ট ফলে সর্বদাই সুক্রোজ থাকে। এটি আমাদের খাদ্য তালিকায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

আবার অনেকগুলো মনোস্যাকারাইড অণু একত্র সংহত হয়ে খুব বড় ও গুরুভার কার্বোহাইড্রেট তৈরী করে ; এদের বলা হয় পলিস্যাকারাইড। অনেক রকমের পলিস্যাকারাইড কার্বোহাইড্রেট উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল স্টার্চ আর সেলুলোজ। কয়েক শ' বা কখনও সহস্রাধিক গ্লুকোজ অণু একত্র পরপর জুড়ে গিয়ে স্টার্চ ও সেলুলোজের সৃষ্টি হয়।

স্টার্চ সমস্ত দেশের খাদ্যেরই মুখ্য উপাদান। ভাত, রুটি, বা আলু মানুষের খাদ্যের প্রধান উপকরণ। এসবের প্রধান অংশই হচ্ছে স্টার্চ। চাল, গম, ভুট্টা, জোয়ার ইত্যাদি নানা দানাশস্য থেকে মানুষ এই খাদ্যটি সংগ্রহ করে। অর্থাৎ উদ্ভিদ থেকেই প্রধান খাদ্য আসছে। দানাশস্য ছাড়াও অনেক উদ্ভিদের শিকড়ে, কন্দে, ফলে, ফুলে স্টার্চ সঞ্চিত থাকে। যেখানে স্টার্চ থাকে, উদ্ভিদের সেই অংশকে খাদ্যের জন্য ব্যবহার করা হয়। আলু, ওল, শশা, কুল, শাক-আলু প্রভৃতিতে যথেষ্ট স্টার্চ রয়েছে। কখনও কখনও সম্পূর্ণ উদ্ভিদই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, যেমন মূলো। স্টার্চ আমাদের পরিপাক যন্ত্রে গিয়ে আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়। টাইলিন, অ্যামাইলোজ প্রভৃতি বিভিন্ন এনজাইম স্টার্চকে অতি সহজে ভেঙে দেয়। রক্তের সঙ্গে সেই গ্লুকোজ দেহের বিভিন্ন কোষে পরিবাহিত হয় এবং সেখানে এর দহন হয় ও শক্তি-উৎপাদন হয়।

উদ্ভিদকোষের দেওয়ালগুলো সেলুলোজ দিয়ে তৈরী। তাছাড়াও উদ্ভিদের নানা অংশে সেলুলোজ রয়েছে। বস্তুতঃ জীবজগতে সমস্ত পদার্থের মধ্যে সেলুলোজের পরিমাণই সর্বাধিক। সেলুলোজ যদিও কার্বোহাইড্রেট, কিন্তু সেটি আমাদের পরিপাক-যন্ত্রে জীর্ণ হতে পারে না। তাই ওটা আমাদের খাদ্য নয় যদিও অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে সেটা আমরা গ্রহণ করি। সেইজন্য চাল, আলু, শাক-সবজী ইত্যাদি খাবার আগে জলে সেদ্ধ করে বা তেলে ভেজে ওদের কোষ-প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হয়। গরু, ঘোড়া, মোষ প্রভৃতির এটি একটি উপাদেয় খাদ্য। কারণ তাদের পাকস্থলীতে এক প্রকার ব্যাকটিরিয়া রয়েছে যেটা সেলুলোজকে ভেঙে সরল করে দেয়। কোষের পর্দায় নানা ডালপালার শক্ত কোষ, কাঠ, তুলা, পাট, ইত্যাদিতে প্রচুর সেলুলোজ থাকে।

উদ্ভিদের কার্বোহাইড্রেট যেরকমই হোক না কেন, সবারই আদিতে রয়েছে সালোক-সংশ্লেষজাত গ্লুকোজ। গ্লুকোজ থেকেই নানা রকম প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেটের সৃষ্টি। গ্লুকোজ প্রথমেই ফসফেটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গ্লুকোজ-ফসফেটে পরিণত হয়। এই গ্লুকোজ-ফসফেটের আবার অনেকটাই ফ্রুক্টোজ-ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। অনেক কোষে এই গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ ফসফেট পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে চিনি (সুক্রোজ) উৎপাদন করে। এ ছাড়া গ্লুকোজ অণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে স্টার্চ, সেলুলোজ প্রভৃতিতে পরিণত হয়। এরকম রাসায়নিক সংযোজন

ল্যাবরেটরীতে করা সুকঠিন এবং দুষ্কর। কিন্তু প্রকৃতিতে কোষের মধ্যে অনায়াসে নানা রকম এনজাইমের সাহায্যে এসব অতি সহজে নিষ্পন্ন হয়। অবশ্য এনজাইম ছাড়াও কোষে উপস্থিত ATP, UDP প্রভৃতি কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ অবশ্য প্রয়োজন হয়।

উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস ইত্যাদি একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া কয়েকটি ধাতব মৌল যেমন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, প্রভৃতিও উদ্ভিদের দরকার। এদের মধ্যে বাতাস থেকে সর্বদা কার্বন সংগৃহীত হয়। কোন কোন জাতের উদ্ভিদ কিছু নাইট্রোজেনকেও বাতাস থেকে টেনে নিতে পারে। কিন্তু আর সব মৌলকেই বিভিন্ন যৌগের আকারে উদ্ভিদ তার শিকড় দিয়ে মাটি থেকে শুষে নেয়। যে ফসফেটের মাধ্যমে গ্লুকোজ থেকে বড় বড় কার্বোহাইড্রেট তৈরী হয়, সেই ফসফেট মাটি থেকেই আসে।

আমাদের দেশের প্রধান খাদ্যবস্তুগুলিতে প্রতি একশ' গ্রামে কি পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট থাকে, তার একটা তালিকা দেওয়া হল।

	কার্বোহাইড্রেট	প্রোটিন	জলীয় ভাগ	অন্যান্য
১। আতপ চাল	৭৬·৭	৭·৫	১৩·৩	২·৬
২। সিদ্ধ চাল	৭৯	৬·৪	১৩·৩	১·৩
৩। সিদ্ধ চাল (ঢেঁকি ছাটা)	৭৭·৪	৮·৫	১২·৬	১·৫
৪। গম	৭১·২	১১·৮	১২·৮	৪·২
৫। আলু	২২·৬	১·৬	৭৪·৭	১·১

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের লোকই প্রধানতঃ গম খেয়ে থাকে। উঃ এবং দঃ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এই সব কয়টি মহাদেশেই গম ব্যবহৃত হয়। শুধু দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়াতে চাল প্রধান খাদ্য। কিন্তু এশিয়ার জনসংখ্যা অনেক বেশী তাই পৃথিবীতে অন্নভোজী লোকের সংখ্যা গমভোজীদের চেয়ে একটু বেশীই। চালের মোট উৎপাদনের ৯০ শতাংশই হয় এশিয়াতে। চীন এবং ভারতেই সবচেয়ে বেশী ধান হয়। অনেক প্রাচীন কাল থেকেই দক্ষিণ এশিয়াতে ধান চাষ হত। আলেকজাণ্ডারের ভারত

অভিযানের পর থেকে গ্রীসে ধান উৎপাদন শুরু হয়। সেখান থেকে সাতের শতকে স্পেনে এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে ইটালীতে ধানের চাষ আরম্ভ হয়। স্পেন থেকেই পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হয়ে ধান আমেরিকাতে গিয়ে আবির্ভূত হয় (১৬০০ খৃষ্টাব্দ)। গত দশকে প্রতি বৎসরে গড়ে বিভিন্ন দেশে যে ধান-উৎপাদন হয়েছে তার পরিসংখ্যান হল ঃ

দেশ		উৎপাদন (লক্ষ টনে)
চীন	—	১০২০
ভারত	—	৭২০
পাকিস্তান ও বাংলা দেশ	—	২৪০
জাপান	—	২০০
ইন্দোনেশিয়া	—	১৯০
থাইল্যান্ড	—	১২২
বর্মা	—	৯৪
ব্রাজিল	—	৬৪

গমের ব্যবহার প্রথম কোথায় শুরু হয়েছিল বলা কঠিন। অনেকের বিশ্বাস, নবপ্রস্তর যুগে মেসোপটেমিয়াতে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস্ নদীর মাঝের উপত্যকায় প্রথম গমের চাষ হয়েছিল। যাযাবর মানুষ খাদ্যান্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে এক ঘাস-বীজের সন্ধান পেয়েছিল — যেটা খাওয়া যায় এবং আবার মাটিতে পুঁতে দিলে সেই বীজের ফসল হয়। এই অত্যাশ্চার্য আবিষ্কারে মানুষ তখন খাদ্য-উৎপাদনের এবং সঞ্চয় করে রাখার একটা উপায় পেয়ে অনেক নিশ্চিন্ত হল। তখন সে ঘরবাড়ী করে দল বেঁধে এক জায়গায় বসতি শুরু করল ; খাদ্যের সন্ধানে সতত সর্বত্র তাকে আর ঘুরতে হবে না। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিদ ব্রেইডউড ইরাকের একটি গ্রামে খনন করে আজ থেকে ৬৭০০ বছরের পুরানো গমের বীজ পেয়েছেন। সেইসব পুরাতন যুগের ব্যবহৃত গম পেষাই যন্ত্র, রান্না করার পাত্র ইত্যাদি বিজ্ঞানীরা উদ্ধার করেছেন। খৃষ্ট জন্মের ৩০০ বছর পূর্বে গ্রীক দার্শনিক থিয়োফ্রাস্টাস ভূমধ্যসাগরের তীরের নানা দেশে যে বিভিন্ন রকমের গম উৎপন্ন হত তার বিবরণ রেখে গেছেন। বিশ্বের বাজারে প্রায়ই গমের পরিমাণ বুশেলে দেওয়া হয় (1 bushel = 60 pounds)। গত দশকে প্রতি বছরে নানা দেশের উৎপন্ন গমের পরিমাণ দেওয়া হল।

দেশ	গমের পরিমাণ (বুশেল)
রাশিয়া	২৩৯৬ 000 000
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	১৪৫৯ 000 000
চীন	৮২0 000 000
ভারতবর্ষ	৬৯0 000 000
কানাডা	৬৮৫ 000 000
ফ্রান্স	৫৩৫ 000 000
অস্ট্রেলিয়া	৪0৫ 000 000
ইটালী	৩৫২ 000 000
তুরস্ক	৩0৮ 000 000
আর্জেণ্টিনা	২৫0 000 000

খই, চিড়ে, মুড়ি এগুলোও স্টার্চ জাতীয় খাদ্য, বিভিন্ন ধান থেকে পাওয়া। আবার নানা রকমের বিস্কুট ময়দা থেকে হয়, সুতরাং গম তার উৎস।

আলু একটি বহুলব্যবহৃত স্টার্চ জাতীয় খাদ্য। আলুর চাষ প্রথমে হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ও বলিভিয়াতে। এই দুই দেশের আণ্ডিস পর্বতের গায়ে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ইন্‌কা-ইণ্ডিয়ানেরা আলু জন্মাত। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য পাহাড়ের উপরে গম হত না। আলু তুলে রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে সেই ময়দার রুটি তারা খেত। ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন ইনকা জয় করার পর, সেখান থেকে আলু নিয়ে এসে স্পেনে চাষ করা হয়। স্পেন থেকে ইটালী এবং সেখান থেকে বেশ তাড়াতাড়িই আলুর চাষ ইংল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। স্বল্পদিনেই আইরিশরা আলুকে তাদের মুখ্য খাদ্যবস্তু হিসাবে গ্রহণ করে। এক সময়ে আয়ারল্যাণ্ডের অর্থনীতি প্রায় সম্পূর্ণই আলু-উৎপাদনের উপর নির্ভর করত। বর্তমানে সবচেয়ে বেশী আলু উৎপাদন হয় রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ও জার্মানীতে। গত দশকে আলুর বার্ষিক গড় উৎপাদন ঃ—

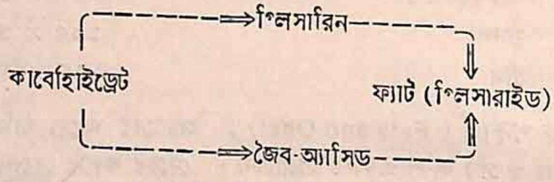
দেশ	আলুর উৎপাদন (পাউণ্ডে)
১। রাশিয়া	১৮১৯×১০^৮
২। পোল্যাণ্ড	১০০১×১০^৮
৩। পূঃ ও পশ্চিম জার্মানী	৫৫২×১০^৮
৪। আঃ যুক্তরাষ্ট্র	৩০৭×১০^৮
৫। ফ্রান্স	১৯৫×১০^৮
৬। চীন	১৫৪×১০^৮

স্নেহ-পদার্থ (Fats and Oils) ঃ আমাদের খাদ্যে খানিকটা ফ্যাট অর্থাৎ তেল ও চর্বি থাকা একান্ত প্রয়োজন। দেহের কলায় তেলের অপচিতি এবং দহনের ফলে শুধু যে প্রচুর শক্তির উদ্ভব হয় তাই নয়, দেহের পুষ্টিতেও তেল যথেষ্ট সাহায্য করে। দুধ, মাখন, ঘি, মাছ, মাংস, ডিম এসব প্রাণীজ খাদ্য অবশ্যই অনেকটা ফ্যাট দেয় ; তবুও সর্বত্রই খাদ্যে যথেষ্ট উদ্ভিজ্জ তেল ব্যবহার হয়। অনেক রান্নাই কোন না কোন তেলের মাধ্যম ছাড়া হয় না। নারকেল তেল, তিল তেল, সরষের তেল, বাদাম তেল প্রভৃতি প্রচুর ব্যবহৃত হয়। সয়াবিনও ফ্যাটের এক অতি মূল্যবান উৎস। অর্থাৎ উদ্ভিদ আমাদের তেল জাতীয় খাদ্যবস্তুর এক প্রধান যোগানদার।

উদ্ভিদের তেল প্রধানতঃ সংগ্রহ করা হয় বীজ থেকে। সরষে, তিল, বাদাম প্রভৃতিকে চাপ দিয়ে পিষে তেল নিংড়ানো হয়। আরও অনেক বীজ থেকেই তেল উদ্ধার করা হয় ; কিন্তু উদ্ভিদজাত সব তেলই খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যায় না। তিসির তেল, কার্পাস বীজ তেল, রেড়ি বা ক্যাষ্টর তেল ইত্যাদি প্রচুর সংগ্রহ করা হয়। এরা খাওয়ার উপযোগী নয় বটে তবে এরাও খুব মূল্যবান। নানা প্রয়োজনে এদের বিস্তর চাহিদা।

উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যেসব তেলের কথা বলা হল, তাদের রাসায়নিক নাম গ্লিসারাইড (glycerides)। গ্লিসারিণের সঙ্গে নানা রকম বড় বড় স্নেহজ জৈব-অ্যাসিডের সংযোগে গ্লিসারাইডের সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদ কোষে এসব তৈলপদার্থ তৈরী হয় কার্বোহাইড্রেট থেকেই। হেক্সোজ, পেন্টোজ প্রভৃতির অণুগুলি একত্র পরপর সংহত হয়ে যে শুধু গুরুভার স্টার্চ, সেলুলোজ প্রভৃতি তৈরী হয় তা নয়। আরও অনেক অনেক রকমের বিক্রিয়া কোষের মধ্যে অণুক্ষণ ঘটছে। হেক্সোজ, পেন্টোজের অণুগুলি আবার ভেঙে ভেঙে সরলতর নানা পদার্থ তৈরী করে। তার মধ্যে প্রধান

একটি হচ্ছে ফস্‌ফো-গ্লিসারিল যৌগ। তাছাড়া, নানা রকমের জৈব অ্যাসিডও তৈরী হতে থাকে। বলা বাহুল্য, এসব রূপান্তরে বহুরকমের এনজাইম ও ATP ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। গ্লিসারিন এবং জৈব-অ্যাসিডের ক্রিয়ার ফলে ফ্যাটের সৃষ্টি হয়।



যেসব অ্যাসিড যুক্ত হয়ে ফ্যাট তৈরী করে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল অলেইক অ্যাসিড (oleic), ষ্টিয়ারিক অ্যাসিড, পামিটিক অ্যাসিড ও লরিক অ্যাসিড (lauric)। গ্লিসারাইড তথা ফ্যাটগুলি কার্বোহাইড্রেটের মতই কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে গঠিত ; যেমন, ট্রাইপামিটিন ফ্যাটের সংকেত $C_3H_5\ (C_{15}H_{31}COO)_3$। ফস্‌ফরাস এবং নাইট্রোজেন যুক্ত ফ্যাটও উদ্ভিদ কোষে প্রায়ই থাকে, তাদের বলা হয় ফস্‌ফো-লিপিড ; যথা লেসিথিন (lecithin)। কোষের গঠনে এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বীজ থেকে তেল সংগৃহীত হয় তথাপি উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ থেকেও তেল পাওয়া যায়। যেমন ইউক্যালিপ্‌টাস ও সিট্রো-নেলা তেল পাওয়া যায় পাতা থেকে। অলিভ তেল জলপাইয়ের ফল থেকে, তার্পিন তেল পাইনগাছের কাণ্ড থেকে, লবঙ্গের তেল তার ফুলের অংশ থেকে। এদের সবগুলো তেল ভোজ্য নয়। বড় বড় পেঁপের মত দেখতে অ্যাভোকাডো ফলের মধ্যে রয়েছে প্রচুর ফ্যাট—এবং সুখাদ্য। উদ্ভিদের কলা এবং কোষেতে (শুষ্ক ও জলে) গড়ে ৫%-এর বেশী ফ্যাট থাকে না। কিন্তু অনেক বীজের মধ্যে এর পরিমাণ ৩৫—৪০ শতাংশ দেখা যায়।

প্রায় সমস্ত ফুলে এবং অনেক ফলে ও বৃক্ষের কোন কোন অংশে সুগন্ধ উদ্বায়ী তেল থাকে। সুগন্ধী দ্রব্যের জন্য এগুলি সংগ্রহ করা হয়। এদের বিষয় পরে আলোচনা করা হবে।

যথেষ্ট ফ্যাট রয়েছে এরকম কয়েকটি বীজ ও বাদামের একটি সারণী দেওয়া হল।

বীজ বা বাদাম	ফ্যাটের পরিমাণ (শতাংশ)
নারকেল (শুকনো)	৬২·৩
তিল	৪৩ ৩
সরষে	৩৯·৭
তিসি	৩৭·১
কাঠবাদাম	৫৮·৯
কাজু বাদাম	৪৬·৯
চীনে বাদাম	৪০·১
আখরোট (খাদ্যাংশ ৪৫%)	৬৪·৫

প্রোটিন (Proteins) ঃ শুধু আমাদের নয়, সমস্ত জীব জগতের—প্রাণী ও উদ্ভিদ—প্রসার, বৃদ্ধি এবং পুষ্টির জন্য প্রোটিন অপরিহার্য। সমস্ত কোষেই প্রোটিন রয়েছে প্রচুর। কোষের প্রাণবস্তু প্রোটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস, এনজাইম প্রভৃতি অনেক কিছুই প্রোটিনের। সমস্ত প্রোটিনই নাইট্রোজেন-যুক্ত জৈব পদার্থ। অসংখ্য রকমের প্রোটিন জীব জগতে রয়েছে। উদ্ভিদ-প্রোটিনে নাইট্রোজেন ছাড়া প্রায়ই সালফার যুক্ত থাকে এবং কোন কোন সময় ফসফরাসও থাকে। প্রোটিনের অণুগুলি বিরাট আকারের এবং অত্যন্ত জটিল। এদের আণবিক গুরুত্ব (mol. wt) দশহাজার থেকে পাঁচ-ছয় কোটি হতে পারে। উদ্ভিদ-প্রোটিনের গড় আনবিক গঠন ধরা যায়, $C_{265} H_{555} O_{174} N_{83} S$। হাজার হাজার রকম প্রোটিনের মধ্যে মাত্র কয়েকটির রচনা-শৈলী জানা গেছে। ক্ষুদ্রতম প্রোটিন ইনসুলিনের (প্রাণীজ) অণুটি পনেরো রকমের মোট ৫১টি অ্যামিনো-অ্যাসিড দিয়ে গঠিত।

প্রত্যেক প্রোটিনই অসংখ্য-অ্যামিনো অ্যাসিড অণু দিয়ে তৈরী। জৈব-অ্যাসিডে অ্যামিনো ($-NH_2$) মূলক থাকলে তাকে অ্যামিনো-অ্যাসিড বলে। অর্থাৎ, অ্যামিনো-অ্যাসিডে নাইট্রোজেন রয়েছে $-NH_2$ মূলক রূপে। যথা, গ্লাইসিন CH_2NH_2COOH ; অ্যালানিন CH_3CHNH_2COOH, ইত্যাদি। এরূপ মোট গোটা কুড়ি অ্যামিনো-অ্যাসিড আছে যেগুলো প্রোটিন সৃষ্টিতে অংশ নেয়। সব প্রোটিনেই সবগুলো অ্যামিনো-অ্যাসিড থাকে না। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যেমন ইটের পর ইট সাজিয়ে ইমারৎ তৈরী হয়, তেমনি এক নির্দিষ্ট সজ্জায় নানা অ্যামিনো-অ্যাসিড যুক্ত হয়ে হয়ে প্রোটিন অণু গড়ে ওঠে। প্রত্যেক প্রোটিনেই তার উপাদান অ্যামিনো-অ্যাসিডগুলোর নির্দিষ্ট

বিন্যাস থাকে। এই বিন্যাসের ব্যতিক্রম হলে ভিন্ন গুণ ও ধর্মের অন্য কোন প্রোটিন বা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ তৈরী হবে।

স্বভাবতঃই প্রোটিন সৃষ্টির জন্য কোষে নানা রকমের অ্যামিনো-অ্যাসিড থাকা প্রয়োজন। এই অ্যামিনো-অ্যাসিড তৈরীর জন্য দুইটি উপাদান চাই : (১) জৈব-অ্যাসিড এবং (২) নাইট্রোজেন-যৌগ। এই দুইয়ের বিক্রিয়ার ফলে অ্যামিনো-অ্যাসিড তৈরী হয়।

আমরা আগেই দেখেছি স্টার্চ জাতীয় কার্বোহাইড্রেট এবং অন্যান্য ফ্যাটের অপচিতির ফলে ছোট, বড় নানারকম জৈব-অ্যাসিড কোষে থাকে। এদেরই কোন কোন অ্যাসিড নাইট্রোজেন ঘটিত অ্যামোনিয়া (NH_3) বা অ্যামোনিয়াম যৌগের বিক্রিয়াতে অ্যামিনো-অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। অ্যাসিডগুলোর মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করা যায় কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড যার সাহায্যেই প্রধানতঃ অ্যামিনো-অ্যাসিডের উদ্ভব হয়।

এছাড়া নাইট্রোজেন সরবরাহও প্রয়োজন। উদ্ভিদ জগৎ ত বায়ুসমুদ্রে ডুবে আছে আর সেই বায়ুর প্রায় ৮০ শতাংশ নাইট্রোজেন। কিন্তু নাইট্রোজেন মৌলটি অনেকটা নিষ্ক্রিয়, সহজে যৌগাকারে ধরা ছোঁয়া দেয় না। কয়েকটি উদ্ভিদ মাত্র বাতাসের নাইট্রোজেনকে টেনে নিয়ে কাজে লাগাতে পারে। ওদের কথায় একটু পরে আসছি। উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন প্রধানতঃ আসে মাটি থেকে। শেকড় মাটি থেকে যে রস শোষণ করে তার সঙ্গে নাইট্রোজেনের যৌগ উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করে। এর একাধিক উপায় রয়েছে।

i) মাটিতে সর্বদাই যথেষ্ট নাইট্রেট (NO_3^-) থাকে। নাইট্রেট জলে অত্যন্ত দ্রাব্য। অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে এই নাইট্রেট শেকড়ের ভেতরে প্রবেশ করে। কিন্তু নাইট্রেট সরাসরি অ্যাসিডের সঙ্গে ক্রিয়া করে না। অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য এই নাইট্রেটকে অ্যামোনিয়াতে পরিণত হওয়া প্রয়োজন। নাইট্রেট-রিডাক্টেজ এবং নাইট্রাইট-রিডাক্টেজ নামের দুই এনজাইমের সাহায্যে নাইট্রেট শেষ পর্যন্ত বিজারিত হয়ে অ্যামোনিয়াতে পরিণত হয়।

নাইট্রেট → নাইট্রাইট → হাইড্রোক্সিল অ্যামিন → অ্যামোনিয়া
(NO_3^-) (NO_2^-) (NH_2OH) (NH_3)

এই অ্যামোনিয়ার সঙ্গে জৈব-অ্যাসিডের বিক্রিয়াতে অ্যামিনো-অ্যাসিড হয়।

ii) প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃত্যু ও ধ্বংসের পর তাদের জৈব অবশেষ মাটিতে

স্থান পায়। তাছাড়া মল, মূত্র ইত্যাদি রয়েছে। পচনের ফলে এদের ভিতরে যে প্রোটিন-পদার্থ রয়েছে সেগুলো ভেঙে গিয়ে অ্যামিনো-অ্যাসিড তৈরী করে। এর কোন কোন সরল অ্যামিনো-অ্যাসিড সরাসরিই কিছুটা উদ্ভিদ-দেহে প্রবেশ লাভ করে। কিন্তু বেশীর ভাগই সূক্ষ্ম জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রথমে অ্যামোনিয়াম যৌগে এবং শেষ পর্যন্ত নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়।

$$\text{অ্যামোনিয়াম } (NH_4^+) \xrightarrow{\text{নাইট্রোসোমোনাস}} \text{নাইট্রাইট } (NO_2^-) \xrightarrow{\text{নাইট্রোব্যাকটার}} \text{নাইট্রেট } (NO_3^-)$$

নাইট্রোসোমোনাস এবং নাইট্রোব্যাকটার এই দুই ব্যাকটিরিয়া জমিতেই থাকে। সেই নাইট্রেট আবার শেকড় শোষণ করে নেয় এবং অ্যামিনো-অ্যাসিডের জন্য ব্যবহার করে। এরকম পচনশীল পদার্থে অনেক সময়েই ইউরিয়া থাকে। ইউরিয়েজ এনজাইম সেটাকে বিশ্লেষিত করে অ্যামোনিয়াতে পরিণত করে। নাইট্রেটের চেয়ে অ্যামোনিয়া আরও সহজে কোষে প্রবেশ করে বিপাক-ক্রিয়াতে অংশ নিতে পারে। এই জন্যই আজকাল জমি উর্বরতা বাড়াতে অ্যামোনিয়াম লবণ আর ইউরিয়া কৃত্রিম সার হিসাবে এত ব্যবহৃত হয়। ফলন বাড়াতে হলে বেশী প্রোটিন চাই এবং তার জন্যই সার দিয়ে নাইট্রোজেন সরবরাহ করতে হয় যাতে যথেষ্ট অ্যামিনো-অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

iii) বাতাসের নাইট্রোজেনকে কয়েকটি ব্যাকটেরিয়া সরাসরি গ্রহণ করে যৌগে পরিণত করতে পারে এবং পরে তা থেকে প্রোটিন তৈরী হয়। <u>Azotobacter</u> <u>croochoccum</u> এবং <u>Azotobacter</u> <u>agile</u> এরকম নাইট্রোজেন-বন্ধন ঘটাতে সক্ষম। কয়েক রকম নীলাভ-সবুজ অ্যালজীও বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে যৌগ উৎপাদন করে। ডঃ প্রাণকুমার দে প্রমাণ করেন অ্যানাবেনা জাতীয় শৈবাল কোষে বাতাসের নাইট্রোজেন শোষণ করে যৌগে রূপান্তরিত করে থাকে (1939)। বড় উদ্ভিদের মধ্যে শুধু লিগুইমিনাস শ্রেণীর অর্থাৎ সিম জাতীয় গাছ বায়ব নাইট্রোজেন ব্যবহারে সক্ষম। এই জাতীয় গাছের শেকড়ের গায়ে অনেক ছোট বড় গুটি বা নডিউল (nodules) জন্মায়। রাইজোবিয়াম গোষ্ঠির ব্যাকটিরিয়া শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই নডিউলের সৃষ্টি করে। শেকড়ের কোষ এবং ব্যাকটিরিয়া মিলে একটি লাল পদার্থের সৃষ্টি করে যেটা বাতাসের নাইট্রোজেন শুষে নেয় এবং নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ যৌগ শেকড়ের কোষে চালান দেয়। বস্তুতঃ এই ব্যাকটিরিয়া

এবং শেকড়ের মধ্যে মিথোজীবিত্ব রয়েছে। শেকড়ের কোষ থেকে ব্যাকটিরিয়া তার খাদ্য পায় আর কোষকে সে নাইট্রোজেন-যৌগ সরবরাহ করে। এরকম বিভিন্ন উপায়ে উদ্ভিদ তার নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে অ্যামিনো-অ্যাসিড তথা প্রোটিন সৃষ্টি করে।

প্রত্যেক কোষেই নিরন্তর অ্যামিনো-অ্যাসিড থেকে প্রোটিন তৈরী হচ্ছে আবার প্রোটিন ভেঙে গিয়ে অ্যামিনো-অ্যাসিডে পরিণত হচ্ছে। এসব বিক্রিয়াতে সর্বদাই নানা এনজাইমের ও ATP ইত্যাদির সাহায্য প্রয়োজন। কখন কোন প্রোটিন ভেঙে যাবে এবং কোন প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরী হবে সেটার নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করে নিউক্লিয়িক অ্যাসিড DNA এবং RNA।

উদ্ভিদের মত মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীরও পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য প্রোটিন প্রয়োজন। প্রাণীর জন্য প্রোটিন মূলতঃ উদ্ভিদ থেকেই আসে। উদ্ভিদের প্রোটিন আর প্রাণীর দেহের কোষের প্রোটিন ঠিক এক নয়। বস্তুতঃ উদ্ভিদ-প্রোটিন প্রাণীর দেহের কোষে এসে নানা এনজাইমের কল্যানে ভেঙে যায় এবং বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। তখন সেই সব অ্যামিনো-অ্যাসিড DNA এবং RNA-এর নির্দেশে নতুন রকমের বিন্যাসে জুড়ে গিয়ে প্রাণীর উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরী করে। শাকজীবী প্রাণীরা সরাসরি ঘাসপাতা, ফল-বীজ থেকে প্রোটিন পায় এবং সেটাকে নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রোটিনে রূপান্তরিত করে নেয়। মানুষ খানিকটা উদ্ভিদ থেকে এবং খানিকটা প্রাণীজ পদার্থ (মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি) থেকে প্রোটিন সংগ্রহ করে। কিন্তু মাংস থেকে (মনে কর, পাঁঠার মাংস) যে প্রোটিন আমরা গ্রহণ করি সেটাও আদিতে ঘাস-পাতা থেকেই এসেছে। দুধের প্রোটিনও অনুরূপ উপায়ে এসেছে। মাছ থেকে আমরা উপাদেয় উৎকৃষ্ট রকমের প্রোটিন পেয়ে থাকি। সহসা মনে হতে পারে, মাছের প্রোটিনের উৎস ত উদ্ভিদ হবে না। কিন্তু এটার মূলেও উদ্ভিদের দান রয়েছে। সাগর-মহাসাগরে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে বিপুল পরিমাণ ফাইটো-প্লাংকটন। এই ফাইটোপ্লাংকটন (যথা, ডাই অ্যাটম, ডায়ানোফ্লাজিলেট, কোকোলিথোফোর ইত্যাদি) হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককোষী উদ্ভিদ। এদের চেয়ে একটু বড় চিংড়ি ও অন্যান্য ছোট্ট মাছের খাদ্য এই ফাইটো-প্লাংকটন। আবার সেই সব চিংড়ি ইত্যাদি খেয়ে বাঁচে আর একটু বড় মাছ। এমনি করে ছোটকে সংহার করে বড় বড় মাছ তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। শুরুতে ফাইটো-প্লাংকটন না থাকলে মৎস্য-জগতই লোপ পেয়ে

যাবে। আবার কিছু মাছ আছে যেমন, grass-carp যারা সরাসরি উদ্ভিদের পাতা খাদ্যরূপে ব্যবহারে করে। দেখা যাচ্ছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রোটিন-খাদ্যের জন্য মানুষ উদ্ভিদের কাছে ঋণী।

আমাদের প্রায় সমস্ত খাদ্যবস্তুতেই কমবেশী প্রোটিন থাকে। চাল, গম, আলু প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট প্রধান খাদ্য হলেও তার মধ্যে কিছু উৎকৃষ্ট ও উপকারী প্রোটিন থাকে। ফ্যাটের জন্য যে সব তৈল বীজ আমরা ব্যবহার করি তাতেও যথেষ্ট প্রোটিন থাকে। প্রকৃতিতে যেখানে ফ্যাট বেশী সখানে প্রায়ই প্রোটিনের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পায়।

উদ্ভিদ থেকে পাওয়া প্রোটিন-প্রধান খাদ্য হল নানা রকমের ডাল। কোন কোন বীজ ও ফল থেকেও প্রোটিন আমরা পাই। 'ফল' বলতে যেগুলি গাছ থেকে তুলে নিয়ে সরাসরি আমরা খাই সেগুলোকে ধরি; যেমন, আম, জাম, পেয়ারা, কুল, আঙুর, আপেল ইত্যাদি, অন্যান্য যেমনঃ ঝিঙে, পটল, সিম, কুমড়া ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞায় ফল হলেও এদের সেদ্ধ না করে বা রান্না না করে খাওয়া যায় না। এদের সব্জীর পর্য্যায়ে ধরা হয়। টমেটো কাঁচা খাওয়া যায় বটে তবে এটা সব্জী বলেই গণ্য। উদ্ভিদজাত খাদ্যের মধ্যে ডালেই প্রোটিন বেশী থাকে। মটর, ছোলা, মুগ, মুসুর প্রভৃতি ডালে প্রোটিনের পরিমাণ সাধারণতঃ ২০~২৫%। এর সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট থাকে ৫৬~৬০%। খেসারী ডালে প্রোটিন ২৮ শতাংশ। কিন্তু এতে কিছু অপকারী পদার্থ রয়েছে। বারবার ধুয়ে নিয়ে এটি ব্যবহার করতে হয়। সয়াবীনে প্রোটিন সর্বাধিক ঃ প্রোটিন ৪৩%, কার্বোহাইড্রেট ২১%, ফ্যাট ২০%।

পুষ্টির জন্য প্রোটিনযুক্ত খাদ্য অবশ্যই প্রয়োজন। কোন খাদ্যবস্তুর পুষ্টিকারিতা একমাত্র প্রোটিনের ওপর নির্ভর করে না। প্রোটিন কি অবস্থায় এবং অন্যবস্তু কি কি সঙ্গে রয়েছে, সেটাও বিচার্য। যেমন,

খাদ্যবস্তু	প্রোটিন (%)	পুষ্টিকারিতা (%)
আলু	১˙৬	৫০
মটরশুঁটি	৭˙২	৩৬
চীনে বাদাম	২৫˙৩	২২
ডিম	১৩˙৩	৮০

ভাইটামিন (Vitamins)ঃ ভাইটামিনের সঙ্গে এখন প্রায় সকলেই

অল্পাধিক পরিচিত। অনেক সময় দেখা যায় খাবারে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও কার্বোহাইড্রেট স্বচ্ছন্দ পরিমাণ থাকলেও দেহের পরিপুষ্টি হয় না। শরীর কাহিল হয়ে পড়ে এবং রোগ দেখা দেয়। যেমন, মিলে ছাঁটা খুব পরিষ্কার চালের ভাত এবং সামান্য শাকসব্জী যদি কিছুদিন খাওয়া হয়, তবে দেহ খুব দুর্বল হয়ে পড়ে, হাত পা ফুলে যায়, স্নায়ুকলার স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়, হৃৎপিণ্ডের প্রসার ঘটে। এ রোগের নাম বেরিবেরি। এ রকম ব্যাধি কিন্তু কোন বিষক্রিয়া বা জীবাণুঘটিত নয়। যদি আকাঁড়া ঢেঁকিছাঁটা চাল, গম, অঙ্কুরিত ছোলা, মটর ইত্যাদি খাদ্যে থাকে তবে এ ব্যাধি হয় না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাভাবিক জীবনধারনের জন্য কতকগুলো অত্যাবশ্যক সহকারী উপাদান খাদ্যে থাকা একান্ত প্রয়োজন। এদের নাম দেওয়া হয়েছে "ভাইটামিন"। যদিও খুবই অল্প পরিমাণে এরা দেহেতে থাকে কিন্তু এরাই বিপাক-ক্রিয়া এবং কলা, কোষ এবং স্নায়ুর স্বাভাবিক কাজকে সাহায্য ও নিয়ন্ত্রিত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাইটামিনগুলো এনজাইমদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের বিক্রিয়াতে সাহায্য করে। বিভিন্ন কাজের জন্য কয়েকরকম ভাইটামিন প্রয়োজন। এদের কয়েকটি জলে এবং অপরগুলি স্নেহে দ্রবনীয়। প্রধান ভাইটামিনগুলির এবং তাদের প্রয়োজনের বিষয় নীচের তালিকায় দেওয়া হল। এর মধ্যে ভাইটামিন- আবার অনেকগুলো ভাইটামিনের সমষ্টি।

	ভাইটামিন	রাসায়নিক নাম	কার্যকারিতা
১।	ভাইটামিন-A	বিটা-আয়োনিনল	চক্ষুরোগ প্রতিষেধক এবং কোষবৃদ্ধির সহায়ক
২।	ভাইটামিন-B		
	B_1	থায়ামিন	বেরিবেরি এবং স্নায়ুরোগ প্রতিষেধক
	B_2	রিবোফ্লেবিন	দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টির সহায়ক
	B_6	পাইরিডক্সিন	পেলাগ্রা-রোগ প্রতিষেধক
	B_{12}	সায়ানোকোবালামিন	রক্তাল্পতা প্রতিষেধক
	নিয়াসিন	নিকোটিনিক অ্যাসিড	চর্মরোগ এবং পেলাগ্রা প্রতিষেধক

এছাড়া ভাইটামিন-B সমষ্টিতে পেন্টোথেনিক অ্যাসিড, ইনোসিটোল, ফলিক অ্যাসিড ইত্যাদি আছে।

৩।	ভাইটামিন-C	অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড	স্কার্ভিরোগ নিবারক
৪।	ভাইটামিন-D	ডিহাইড্রোকালেস্টেরোল	রিকেটস রোগের প্রতিষেধক
৫।	ভাইটামিন-E	আল্‌ফা-টোকোফেরল	বন্ধ্যাত্ব প্রতিষেধক
৬।	ভাইটামিন-K	ন্যাপথো-কুইনোন	রক্তের তঞ্চন সহায়ক

এদের মধ্যে ভাইটামিন-A, D, E স্নেহে দ্রবনীয় আর ভাইটামিন-B, C এবং K জলে দ্রবনীয়। বেশী ভাইটামিনই খাদ্যের সঙ্গে দেহে প্রবেশ করে, দুই একটি দেহের মধ্যে সৃষ্টি হয়। আমাদের প্রাণিজ খাদ্য দুধ, মাখন, মাংস, লিভার ইত্যাদিতে প্রায় সবগুলি ভাইটামিন রয়েছে। আমরা এখানে উদ্ভিদের বিষয় আলোচনা করছি। জলে দ্রাব্য ভাইটামিনগুলির অনেকটাই উদ্ভিদ থেকে আমরা পেয়ে থাকি।

ক্যারট বা গাজরে যে হলুদ রংয়ের পদার্থটি রয়েছে তার নাম ক্যারোটিন। ক্যারট থেকে প্রথম আবিষ্কার হয় বলে এই নাম। প্রাণী দেহে এই ক্যারোটিন থেকেই ভাইটামিন-A তৈরী হয়। অতএব ভাইটামিন-A এর জন্য উদ্ভিদের দেওয়া ক্যারোটিনের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রায় সব সবুজ শাক-সব্জীতেই অল্পাধিক ক্যারোটিন থাকে। এর মধ্যে পালংশাক, নটেশাক, সজনে পাতা, ধনে পাতা, মুলোশাক, সরষে শাক, পুদিনা, সবুজ বাঁধাকপিতে প্রচুর ক্যারোটিন আছে। তাছাড়া পাকা আম, পেঁপে, টমেটো, মিষ্টি কুমড়ো প্রভৃতিতে যথেষ্ট ক্যারোটিন থাকে।

B-ভাইটামিনগুলির প্রধান উৎস উদ্ভিদ। থায়ামিন ঢেঁকিছাটা চাল, লাল গম, ইষ্ট, অংকুরিত ছোলা, মুগ ইত্যাদিতে থাকে। ভাইটামিনগুলি একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু পরিমাণে খুব সামান্য হলেই চলে। প্রতি টন চালের কুঁড়াতে আনুমানিক ৮-১০ গ্রাম মাত্র থায়ামিন থাকে। সুতরাং আমাদের প্রতিদিনের অন্নে কতটুকুই বা থায়ামিন থাকে। কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট। বিভিন্ন B-ভাইটামিনগুলোর প্রধান উৎস হল ঃ—

উদ্ভিদ উৎস

থায়ামিন (B_1)	—	লাল চাল, লাল গম, ঈষ্ট, টমেটো, অঙ্কুরিত ছোলা, মটর ইত্যাদি
রিবোফ্লেবিন (B_2)	—	নটে, কল্মী, পালং, লেট্যুস ইত্যাদি শাকে, অঙ্কুরিত গমে, গোটা ডালে, লেবু জাতীয় ফলে,—
নিয়াসিন	—	চালের কুঁড়া, চীনেবাদাম, ঈষ্ট, গমের অংকুর ইত্যাদি
পাইরিডক্সিন (B_6)	—	অঙ্কুরিত গম, চালের কুঁড়া, ইষ্ট, বিভিন্ন ডাল ও বাদাম
সায়ানো কোবালামিন (B_{12})	—	রসাল সবুজ পাতায়, ব্যাঙের ছাতায় ও ঈষ্টে।

ভাইটামিন-C আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যে একান্ত প্রয়োজন। চাল, গম প্রভৃতি দানাশস্য, ডাল, বাদাম, তৈলবীজ প্রভৃতিতে ভাইটামিন-C নেই। ফল এবং শাকসব্জীতেই সর্বাধিক এই ভাইটামিন থাকে। সব চেয়ে বেশী ভাইটামিন-C থাকে আমলকীতে। প্রতি ১০০ গ্রামে কতটা এই ভাইটামিন আছে তার একটা সারণী দেওয়া হল ঃ—

প্রতি ১০০ গ্রামে ভাইটামিন-C এর পরিমাণ (মিলিগ্রামে)

	পরিমাণ		পরিমাণ
আমলকী	৬০০	কচি নিমপাতা	২১৮
পেয়ারা	২১২	পার্সলী শাক	২৮১
কাজু ফল	১৮০	নটে শাক	৯৯
কমলা ও অন্যান্য লেবু	৬৪	সজনে শাক	২২০
কাঁচা লঙ্কা	১১১	কলমী শাক	১৩৭
বাঁধা কপি	১২৪	ধনে পাত	১৩৫

ভাইটামিন-D উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায় না। ভাইটামিন-E লেট্যুস শাক, অঙ্কুরিত গম, মটর, চা ও আল্ফা-আল্ফা ঘাসে রয়েছে। এই ঘাসে

ভাইটামিন-Kও আছে এবং অন্যান্য শাকপাতা, গাঁদাফুলের পাতা, বাঁধাকপিতে রয়েছে। রক্তের তঞ্চনে এটি সাহায্য করে। অনেক বাড়ীতেই বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে হঠাৎ কেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকলে প্রথমেই গাঁদাফুল গাছের পাতার রস প্রয়োগ করা হয়।

দেখা গেছে উদ্ভিদ শুধু মুখ্য খাদ্য প্রোটিন, ফ্যাট ইত্যাদিরই যোগানদার নয়, তাদের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ভাইটামিনের অনেকটাই উদ্ভিদ থেকে আসে। এর জন্যও উদ্ভিদের কাছে আমরা ঋণী।

খনিজ লবণ ঃ প্রোটিন, ফ্যাট প্রভৃতি জৈবজাতীয় খাদ্যবস্তুর সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কয়েকটি অজৈব মৌলও দরকার। এদের মধ্যে আয়রন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ও পটাসিয়াম একান্ত প্রয়োজন। এ ছাড়া লেশমাত্র পরিমাণে (as traces) আইওডিন, কপার, জিঙ্ক, মলিবডিনাম, ম্যাঙ্গানিজও প্রয়োজন। ওগুলো প্রধানতঃ বিভিন্ন লবণ হিসাবে আমরা গ্রহণ করে থাকি। এসব খনিজ লবণের অনেকটাই উদ্ভিদ মাটি থেকে সংগ্রহ করে আমাদের খাদ্যে সরবরাহ করে। সোডিয়াম অবশ্য আমরা সরাসরিই নুন হিসাবে প্রতিদিন খাই। সোডিয়াম এবং পটাসিয়াম লবণ প্রতি কোষ এবং কলার জলীয় তরল দ্রবণে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকা প্রয়োজন। এদের এই অনুপাতে থাকার উপর কোষের স্বাভাবিক ক্রিয়া নির্ভর করে। প্রতিদিনই ঘাম ও মলমূত্রের সঙ্গে যথেষ্ট লবণ বেরিয়ে যায়। সেটা পূরণ করতে ০·৫ গ্রাম সোডিয়াম খাদ্যে থাকা উচিত। পটাসিয়াম আসে শাকসব্জী থেকে।

আয়রন বা লোহার গুরুত্ব যথেষ্ট। আয়রন না হলে রক্ত কণিকার হেমোগ্লোবিনই তৈরী হবে না। সুতরাং রক্তাভাবে জীবন লোপ পাবে। এই লোহার জন্য আমরা প্রধানতঃ নির্ভর করি সবুজ শাকসব্জীর উপর। কোন কোন দানাশস্য যেমন, রাগী বা বাজরাতেও বেশ লোহা আছে।

আমাদের শরীর হাড়, দাঁত প্রভৃতি কঠিন অংশগুলির বেশীর ভাগই ক্যালসিয়াম ফসফেট থেকে তৈরী। খানিকটা ম্যাগনেসিয়াম লবণও তার সঙ্গে থাকে। সবুজ পাতার ক্লোরোফিল ম্যাগনেসিয়াম যোগান দেয়। ক্যালসিয়াম দুধে যথেষ্ট রয়েছে বটে, তবে আমাদের গরীব দেশে দুধ ত অনেকের ভাগ্যেই জোটে না। সবুজ শাকসব্জী, ডাল এসব ক্যালসিয়ামের প্রধান উৎস। সজনে শাক, মেথী শাক, নটে শাক প্রভৃতিতে প্রচুর ক্যালসিয়াম আছে।

১০০ গ্রামে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ (মিলিগ্রাম)

শাক ঃ	কাঁটা নটে	কারিপাতা	মেথী শাক	সজনে শাক	মূলো শাক
	৮০০	৮৩০	৩৯৫	৪৪০	৩১০
ডাল ঃ	সয়াবীন	ছোলা	রাজমা	মুগ	মটর
	২৪০	৩৭২	২৬০	১২৪	৬৯

একটা অসুবিধা আছে। কোন কোন সব্জীতে যেমন পালং বা নটে শাকে অক্সালেট আছে। ক্যালসিয়াম অক্সালেটের সঙ্গে মিলে অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম অক্সালেট তৈরী করে। সেক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম থাকলেও আমাদের উপকারে আসে না।

উদ্ভিদ মাটি থেকে ফসফরাস সংগ্রহ করে তার নিজের প্রয়োজনের ATP, NADP এবং নানা ফসফরাস যৌগ, লিপিড জাতীয় যৌগের জন্য। সেখান থেকেই আমাদের ফসফরাস আসে। ডাল, গম, বাদাম, ভুট্টা, তৈলবীজ প্রভৃতিতে যথেষ্ট ফসফরাস রয়েছে।

আয়রন, ফসফরাস সমৃদ্ধ যেসব সব্জী বাঙ্গালীরা সচরাচর খায় তার একটা তালিকা দেওয়া হল। ভাইটামিন-B-এর পরিমাণও দেওয়া হল।

শাকসব্জী (১০০ গ্রাম)

	ফসফরাস	আয়রন	থায়ামিন	রিবোফ্লেবিন (মিলিগ্রাম)
ফুলকপি	৫৭	১·৫	০·০৪	০·১০
বাঁধাকপি	৪৪	০·৮	০·০৬	০·০৯
টমেটো	২০	০·৪	০·১২	০·০৬
মটরশুটি	১৩৯	১·৫	০·২৫	০·০১
সিম	১৬০	২·৬	০·৩৪	০·১৯
বেগুন	৪৭	০·৯	০·০৪	০·১১
মুলো	২০	০·৫	০·০৬	০·০২
ঢেড়স	৫৬	১·৫	০·০৭	০·১০
লাউ	১০	০·৭	০·০৩	০·০১
কুমড়া	৩০	০·৭	০·০৬	০·০৪
ঝিঙা	২৬	০·৫	——	০·০১
পালং শাক	২১	১০·৯	০·০৩	০·২৬
সরষে শাক	২৬	১৬·৩	০ ০৩	——
লেটুস শাক	৮০	২·৬	——	——
মেথী শাক	৫১	১৬·৫	০·০৪	০·৩১

শাকসব্জীর আনুমানিক ৯০ শতাংশই জল ; প্রোটিন ০·২~·২০%, ফ্যাট ০·১~০·৪%, শ্বেতসার ৩~৪%।

দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ ভাইটামিন এবং খনিজ লবণের প্রায় সবটাই আমাদের উদ্ভিদ-খাদ্য থেকে সংগ্রহ করতে হয়। সব দেশেরই খাদ্য-তালিকায় সবুজ শাকসব্জীর স্থান থাকেই। যে কয়টি দেশে বেশী সব্জী উৎপাদন হয়, সেগুলো হল :–

সব্জীর গড় বার্ষিক উৎপাদন

দেশ	সব্জী উৎপাদন (লক্ষ টনে)	দেশ	সব্জী উৎপাদন (লক্ষ টনে)
রাশিয়া	১০৮৪	আঃ যুক্তরাষ্ট্র	২৬৯
চীন	৮৮৩	ভারতবর্ষ	২৩৩
পোলান্ড	৫২১	নাইজেরিয়া	২১১
ব্রাজিল	৪০৮	ইন্দোনেশিয়া	১৪৮

ভূমির উর্বরতায় উদ্ভিদ : জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধির জন্য এখন খাদ্যশস্যের প্রচুর চাহিদা। ধান, গম, ডাল, সব্জী, সব ফসল উৎপাদনেই জমি যথেষ্ট উর্বর থাকা প্রয়োজন। উর্বরতা নির্ভর করে জল এবং জমির সারের উপরে। এর জন্য উদ্ভিদ যে নিজেই নিঃশব্দে নিরন্তর সাহায্য করে চলেছে সে কথা সহসা আমাদের মনে আসে না।

জলের জন্য বৃষ্টি আমাদের প্রধান সহায়। বৃষ্টিপাত আর দেশের বন-জঙ্গলের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। জলভরা মেঘ গভীর ও বিস্তৃত বনজঙ্গলের সংস্পর্শে এলে বৃষ্টিধারার সৃষ্টি হয়। যেখানে বনজঙ্গল নেই, সেখানে বৃষ্টিপাত খুব কম, জমি অনুর্বর এমন কি মরুময়। দেশের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ বনজঙ্গল থাকা প্রয়োজন, তা না হলে বৃষ্টির অভাবেই ফসল হ্রাস পাবে। এই কারণেই আজকাল বনরক্ষণ ও বনমহোৎসবের এত তাগিদ। বনজঙ্গলের গাছপালাই বৃষ্টিকে ডেকে এনে জমির উৎপাদনে সাহায্য করে।

গাছের শেকড় ত মাটিতে রয়েছেই। গাছের ডাল, লতাপাতা ইত্যাদি ঝরে মাটিতেই পড়ে। সেখানে জলের সান্নিধ্যে নানারকম ব্যাক্টীরিয়া ও জীবাণুর আক্রমণে পচে গিয়ে জৈব জাতীয় নরম পদার্থ "হিউমাসে" পরিণত হয়। এই হিউমাস অত্যন্ত মূল্যবান। এটি উদ্ভিদের এক প্রধান খাদ্য ত

বটেই, তাছাড়া নানাভাবে হিউমাস মাটিকে উর্বর করে তোলে। অর্থাৎ উদ্ভিদ নিজের ধ্বংসের ভেতর দিয়েও উত্তরকালের ফসলের সৃষ্টিতে সাহায্য করে। কবিগুরুর ভাষায়, "Dead leaves when they lose themselves in soil take part in the life of the forest" (Fireflies, 265).

এই জন্য আজকাল প্রায়ই দেখা যায় চাষের জমিতে সিম জাতীয় গাছ (কলাই, মুগ) লাগানো হয়—উর্বরতা বাড়াবার জন্য। পরিপুষ্ট হলে সে-গুলোকে কেটে জমির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এতে জমি দু'ভাবে উর্বরা হয় ঃ ১) সিমের শেকড়ের নডিউল থেকে নাইট্রেট তথা নাইট্রোজেন আসে আর ২) নরম কান্ড ও পাতা থেকে "হিউমাস" তৈরী হয়।

বৃষ্টিধারায় বা জলস্রোতে অনেক সময় জমির উপরের মাটির স্তর ভেসে চলে যায়—ভূমির অবক্ষয় ঘটে। জমির উপরের স্তরের মধ্যেই উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় সার খনিজ লবণ, হিউমাস প্রভৃতি থাকে। সেটা চলে গেলে জমির উর্বরতা খুব হ্রাস পায়। কখনও তীব্র বায়ুপ্রবাহেও জমির স্তর উপর থেকে ধুলো হয়ে উবে যায়। আগে প্যালেষ্টাইন (বর্তমান ইজরায়েল) খুবই উর্বরা ছিল। ক্রমাগত অবক্ষয়ের ফলে এখন তার অধিকাংশই অনুর্বর হয়ে পড়েছে। গ্রীসেরও এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভূমিক্ষয়ে এরকম অনুর্বর হয়েছে। কতকগুলি উদ্ভিদ আছে যেগুলি খুব দ্রুত বাড়ে এবং তাদের শেকড় বহু বিস্তৃত হয়। ভূমিক্ষয় রোধ করতে এ ধরনের গাছ লাগানো হয়। এদের শেকড় মাটিকে দৃঢ় করে আট্‌কে রাখে, মাটির খনিজ সার ইত্যাদি চলে যেতে পারে না। সমুদ্রতীরের বা জলস্রোতের ভাঙন রোধ করতে এরকম গাছের সারি লাগান হয়। দীঘার সমুদ্রতটের ভাঙন এভাবে ঝাউ casurina equisetifolia) গাছ লাগিয়ে খানিকটা বন্ধ করা গেছে। এ জাতীয় আরও কয়েকটি গাছ হল ; খস্‌-খস্‌ বা বেনা (Andrographis squarossus), কাশ (Soccharum spontanum), বাব্‌লা (Acacia arabica), লাঙ্গুলি লতা (Ipomea pescoprae ., সুবাবুল (Leuciena latesiliqua), সোমিবৃক্ষ (Prosopis spicigera), পলাশ (Butea monosperma), কাজু (Anacardium occidentate) ইত্যাদি। পাহাড়ী অঞ্চলে পাইন, অরোকেরিয়া ইত্যাদি মুক্তবীজী অনেক উদ্ভিদের ভূমিক্ষয় রোধ করার ক্ষমতা আছে। বাইরে থেকে আনা ক্রিপ্‌টোমেরিয়া জাপোনিকা আজকাল অনেক স্থলে ব্যবহার হচ্ছে।

খাদ্যের স্বাদুতা : ফল আমরা সরাসরি খাই, কিন্তু অন্যান্য সব ভোজ্যবস্তু—কি আমিষ কি নিরামিষ—রান্না করে খাওয়ার উপযোগী করে নিতে হয়। শুধু সেদ্ধ করা বা ভেজে নেওয়াটাই রান্না নয়। খাবার যাতে উপাদেয় এবং রসনা-তৃপ্তিকর হয় তার জন্য নানা উপকরণ মিশিয়ে তাকে স্বাদু এবং সুরভিত করে নেওয়া হয়। রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার রকমের রান্না খাবার তৈরী হয়। বস্তুতঃ রন্ধন এক বিশেষ শিল্পকলা। যে সব উপকরণ ব্যবহার হয়, তার মধ্যে মশলাই বেশী প্রয়োজন। উপকরণের ৯৮ শতাংশই মশলা। আর মশলা তো উদ্ভিদজাত। আমাদের দেশে সর্বদা ব্যবহৃত হলুদ, লংকা, ধনে, জিরে, আদা, সরষে, তেজপাতা, গোলমরিচ, মৌরী, মেথী প্রভৃতি তো বটেই, তাছাড়া পেস্তা, বাদাম, চিনি, তেঁতুল, কিসমিস, টমেটো, জৈত্রী, জায়ফলও ব্যবহৃত হয়—এসবই গাছ থেকে সংগৃহীত। এমন কি কুলীন উপকরণ এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গও উদ্ভিদই সরবরাহ করে। রং করার জন্য যে জাফরান ব্যবহার করা হয় তাও গাছ থেকে সংগৃহীত। এসবের কোনটা ফল, কোনটা ফুল, কোনটা কাণ্ড, কোনটা শেকড়, কোনটা বীজ। এই মশলাগুলির প্রায় সবগুলিই নিরক্ষীয় গ্রীষ্মমন্ডলের দেশগুলোতে হয়; প্রধানতঃ মলাক্কা, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম, সিংহল প্রভৃতি দেশে মশলা প্রচুর হয়। মশলা রপ্তানি এসব দেশের এক বিশেষ ব্যবসা। হলুদ দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সর্বত্রই হয়। আমাদের দেশের মালাবার উপকূলের এলাচ পৃথিবীখ্যাত। দাক্ষিণাত্যের অন্যত্র, সিংহলে এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও এলাচ হয়। এসব অঞ্চলেই আবার দারুচিনির গাছ রয়েছে, যার বাকল থেকে দারুচিনি সরবরাহ হয়। লবঙ্গ আমাদের দেশে বেশী নেই। মলাক্কা, সুমাত্রা, জাভা, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশ থেকে লবঙ্গ আসে।

দেখা যাচ্ছে উদ্ভিদ খাদ্য দেয়, ফসল-উৎপাদনে সাহায্য করে আবার খাদ্যকে উপাদেয় করার উপকরণ তেল, চিনি, মশলা এসব সরবরাহ করে। খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের কাছে হাত না পেতে উপায় নেই।



॥ ৩ ॥

উদ্ভিদ থেকে পরিধেয়

প্রাগইতিহাসের মানুষ লজ্জা-নিবারণের জন্য অবশ্যই প্রথমে বৃক্ষের বল্কল ব্যবহার করেছিল। গাছের কাণ্ডের পাত্‌লা ত্বক তুলে নিয়ে নিজেকে আবৃত করেছিল। তাছাড়া খাদ্যের জন্য যেসব পশু শিকার করত তার চামড়া শুকিয়ে নিয়েও ব্যবহার করত। পরবর্তী পদক্ষেপে লতাপাতা, ঘাস, শণ ইত্যাদি গেথে নিয়েও আচ্ছাদন তৈরী করত। আজ এই অতি-উন্নত সভ্যতার যুগেও কোন কোন দুর্গম গভীর অরণ্যে আদিম অধিবাসীদের এরকম লতা-পাতা বা ঘাসের গুছি দিয়ে লজ্জা-নিবারণ করতে দেখা যায়। প্রাচীনকাল থেকেই শণজাতীয় উদ্ভিদের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়েছিল। শণের আঁশ থেকেই প্রথম বস্ত্র তৈরী হয়েছিল। নব্য প্রস্তর যুগে মানুষের বুদ্ধি যখন অনেকটা শাণিত হল এবং কর্ম-কুশলতা বৃদ্ধি পেল, মানুষ তখন চাষবাস শুরু করল, বাস করার ঘরবাড়ী তৈরী করতে শিখল, আর তখন সে আঁশ নিয়ে বুনট করতেও শিখে গেছে। কৃষির উন্নতির জন্য সঙ্গে সঙ্গে তিসি, অতসী, শণগাছ, (fiax and hemp) প্রভৃতির চাষ আরম্ভ হয়েছিল। "বয়ন বিদ্যার আবিষ্কার নব্য প্রস্তর যুগের শেষের ঘটনা।"[১] এযুগে মিশরে বেশ উন্নত মানের ক্ষৌমবস্ত্র বা linen শণের আঁশ থেকে তৈরী হত। নীলনদের উপত্যকায় ভাল শণগাছ বা তিসির চাষ হত। আজ থেকে প্রায় ৭০০০ বছরের পুরোনো মিশরীয় কবর থেকে প্রত্নবিদেরা খুব সুন্দর এবং বড় বড় ক্ষৌমবস্ত্র আবিষ্কার করেছেন। সমসাময়িককালে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার যুগেও ঐরকম লিনেন যথেষ্ট ব্যবহার হত। গ্রীক ও রোমক সভ্যতার কালে অধিকাংশ পরিধেয়ই ছিল শণ থেকে তৈরী লিনেন।

গ্রীক-পুরাণে একটি মজার কাহিনী আছে। সে দেশের একটি মেয়ে নাম আরনে (Archne) অতি সূক্ষ্ম কাপড় বুনতে পারত। সে গর্ব করে বলত স্বর্গের দেবীরাও এরকম কাপড় বুনতে পারবে না। একথা শুনে দেবী এথেনা ক্রুদ্ধ হয়ে মেয়েটিকে একটা মাকড়সায় পরিণত করে দিয়ে অভিশাপ

১। বিজ্ঞানের ইতিহাস—সমরেন্দ্রনাথ সেন

দিয়েছিলেন, তুমি দিনরাত বসে বসে সুতোই কাটবে। সেই থেকে দুনিয়ার সব মাকড়সা সর্বদা সুতো কাটছে।

ইতিমধ্যে তুলোর চাষ শুরু হয়েছে এবং তার আঁশ থেকে বস্ত্রবয়ন সহজতর হয়েছে। খৃষ্টজন্মের প্রায় তিনহাজার বছর আগের সিন্ধু সভ্যতার সময়ও তুলাজাত বস্ত্র ব্যবহার হত। মহেঞ্জোদারো থেকে যে সমস্ত বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে তার মধ্যে একটি রূপার পাত্রে কিঞ্চিৎ তুলা ও কাপড় লেগে রয়েছে, কিছু সুতোর গোছাও পাওয়া গেছে। তবে কি রকম যন্ত্রের সাহায্যে প্রাচীন যুগে সুতাকাটা হত বা বস্ত্রবয়ন হত সেটা জানা যায় নি। খুব সম্ভবতঃ সে সব যন্ত্র কাঠের তৈরী ছিল বলেই কালক্রমে ধ্বংস হয়ে গেছে।

তুলার ব্যবহার এবং বীজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তুলো থেকে সুতা তৈরীর কৌশল সর্বপ্রথমে ভারতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। চরকাও প্রথমে ভারতেই উদ্ভাবিত হয়েছিল, ঋক্‌বেদে তুলার উল্লেখ আছে। খৃষ্টজন্মেরও সাড়ে চারশ' বছর আগে গ্রীক দার্শনিক হেরোডোটাস লিখে গেছেন, ভারতের মেয়েরা তুলা থেকে অতি সুন্দর বস্ত্র বয়নে বিশেষ পারদর্শিনী। মিশরে আগের দিনে ক্ষৌমবস্ত্রই ব্যবহৃত হত। খৃষ্টজন্মের ছয়শত বছর পরে মিশরে তুলার চাষ এবং তুলাজাত বস্ত্রের প্রচলন হয়।

মেগাস্থিনিস (খৃষ্টপূর্ব ৩ শতক) বর্ণনা দিয়েছেন, ভারতেব অনেকে অতি সূক্ষ্ম নানা রঙের মসলিনের উপর সোনার কাজকরা পোষাক পরিধান করত। ভারত থেকে বস্ত্রবয়নশিল্প পারস্যে যায়। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পর এই শিল্প গ্রীসে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে সারা ইউরোপে প্রসারিত হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে রোমে ঢাকার মসলিনের প্রচুর আদর ছিল। এই মসলিনের নাম ছিল, নেবুলা, গ্যাঞ্জেটিকা, ভেন্তি ইত্যাদি।

বর্তমানে পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ মানুষই তুলাজাত বস্ত্র, জামা কাপড় অর্থাৎ পরিধেয় ব্যবহার করে। কিছু কাপড় শন থেকেও তৈরী হয়। শীতপ্রধান দেশের লোকেদের প্রায়ই পশুর লোম থেকে তৈরী পশমের পরিধেয় প্রয়োজন হয়। এছাড়া রেশমের গুটিপোকা থেকে যে সিল্ক তৈরী হয়, সেটাও ব্যবহার হয়। তবে রেশম ও পশমের ব্যবহার তুলাজাত বস্ত্রের তুলনায় অনেক কম। সুতরাং প্রাচীনকালের মত এখনও আমরা জামাকাপড়ের জন্য উদ্ভিজ্জ তুলার উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করি। আধুনিক কালে অবশ্য রেয়ন, নাইলন জাতীয় কৃত্রিম তন্তু থেকেও খানিকটা বস্ত্রবয়ন শুরু হয়েছে। এখনও মোট পশম ও রেয়নের তুলনায় তুলার উৎপাদন ও ব্যবহার অন্ততঃ চারগুণ।

বস্ত্রের জন্য যে গাছ থেকে তুলা সংগ্রহ করা হয় তার নাম হল কার্পাস বা কাপাস ; বৈজ্ঞানিক নাম Gossypium। এই তুলা গাছের ফল সম্পূর্ণ পুষ্ট হলে আপনা থেকেই ফেটে যায়। তখন দেখা যায় বীজের চারদিকে দুধের মত সাদা থোকা থোকা তুলোর আঁশ রয়েছে। বীজ ছাড়িয়ে তুলো সংগ্রহ করা হয়। তুলা প্রায়-বিশুদ্ধ সেলুলোজ। এই আঁশ থেকে তকলী বা চরখার সাহায্যে সূতা তৈরী হয়। এককালে বস্ত্রবয়ন একটা কুটির-শিল্প ছিল। ঘরে ঘরে কাপড় বোনা হত—নিজেদের প্রয়োজনে এবং বিক্রির জন্য। অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় প্রথম যন্ত্রচালিত বহু টাকুযুক্ত চরকা (spinning-jenny) আবিষ্কৃত হওয়ার পর কাপড়ের কল স্থাপিত হতে শুরু হল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এলি হুইটনী এবং ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে হগডেন হোমস-এর চেষ্টায় বীজ থেকে তুলার আঁশ বের করে আনার যন্ত্র উদ্ভাবিত হল। সুতরাং খুব সহজে কাপড়ের কলে প্রচুর তুলা যোগান দেওয়া সম্ভব হল। বর্তমানে অধিকাংশ কাপড়ই মিলে তৈরী।

বস্ত্রজগতের সাম্রাজ্ঞী হল ঢাকার মসলিন, যার খ্যাতি সারা বিশ্বে। তুলা থেকেই সূক্ষ্মতম সূতা তৈরী করে নিয়ে হস্তচালিত তাঁতেই ঢাকার শিল্পীরা ঐ মসলিন তৈরী করত। একটি দশহাত মসলিন শাড়ীকে এক হাতের মুঠোতে ভরে রাখা যেত। সে যুগে ঢাকার মসলিন রপ্তানি হত সারা দুনিয়ার রাজ-রাজরাদের কাছে। কথিত আছে, ল্যাঙ্কারসায়ারের বস্ত্র-শিল্পের প্রসারের জন্য সহৃদয় (!) ব্রিটিশরা এসে ভারতের মসলিন শিল্পীদের আঙুল কেটে পঙ্গু করে দিয়েছিল। ফলে, মসলিন উৎপাদন বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

প্রায় ৪৭°উঃ অক্ষাংশ এবং ৩৫° দঃ অক্ষাংশের মধ্যের দেশগুলিতেই তুলা জন্মায়। কতকগুলি বিশেষ অঞ্চলে তুলা গাছের ফলন হয় ভাল ; যেমন, মিশরের নীলনদের উপত্যকায়, ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে, পাকিস্তানে, আঃ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে। এশিয়াটিক রাশিয়ার মালভূমিতে উত্তম তুলা উৎপন্ন হয়। তুলা গাঁট হিসাবে মাপা হয় ; প্রতি গাঁটের ওজন ৫০০ পাউন্ড। সাতের দশকের কয়েকটি দেশের গড় বাৎসরিক তুলা উৎপাদনের পরিমাণ দেওয়া হল। আমেরিকার এবং মিশরের তুলার আঁশগুলো দীর্ঘতর এবং সুদৃশ্য সেজন্য বিশেষ সমাদৃত। আমাদের কাপাসের আঁশ বেশী লম্বা নয় এবং কিঞ্চিৎ কঠিনতর।

তুলার বাৎসরিক উৎপাদন (লক্ষ গাঁটে)

দেশ	তুলার উৎপাদন	দেশ	তুলার উৎপাদন
আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র	১০০·৫	ব্রাজিল	৩১·০
রাশিয়া	৮৯·৫	পাকিস্তান	২৪·৮
চীন	৬৮·০	মিশর	২৩·৫
ভারত	৫১ ০	তুরস্ক	১৭·০

আজকাল বাজারে মারসারাইজড mercerised) কাপড় পাওয়া যায়। যে সুতো থেকে এই কাপড় তৈরী হয় সেই সুতোকে গাঢ় কষ্টিক সোডার দ্রবণে নিষিক্ত করে নিতে হয়। তাহলে সেই সুতো প্রায় সিল্কের মতো উজ্জ্বল দেখায় এবং সুতোর শক্তি এবং ঋজুতাও বাড়ে। ১৮৫০ সালে জন মার্সার এটা আবিষ্কার করেন। সেই জন্য এই পদ্ধতির নাম মারসারাইজেসন।

সুতো থেকে যে বস্ত্র তৈরী হয় তার সবই যে আমাদের দেহের আবরণের জামাকাপড়, পরিধেয়, চাদর, টুপি, মোজা, ইত্যাদির জন্য তা নয়। কাপড়ের আরও অনেক চাহিদা রয়েছে ; রুমাল, গামছা, বিছানার চাদর বালিশের খোল, শয্যার সব কিছু, পরদা, ব্যাগ, ঢাকনা, তাঁবু, তেরপল, বই-বাঁধাই, ব্যান্ডেজ, টেবল-ক্লথ, নৌকোর পাল, টাইপের রিবন, পতাকা, বস্তা, অয়েল-ক্লথ, ডাকঘরের ব্যাগ, জুতোর লাইনিং—এমনি হাজারো রকম কাজে বিভিন্ন ধরনের কাপড় লাগে। সুতার মাধ্যমে উদ্ভিদই এসব প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

আগেই বলেছি, তুলার ব্যবহার আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মসীনা (তিসি) গাছ এবং শনগাছের তন্তু থেকে উত্তম ক্ষৌমবস্ত্র বা লিনেন তৈরী হত। সে সব কাপড় অবশ্য মোটা হত কিন্তু খুব সুন্দর ও টেকসই হত। আজও অনেক দেশে, বিশেষতঃ ইউরোপে শনজাতীয় তন্তু থেকে গামছা, তোয়ালে, টেবল-ক্লথ, মাছধরার জাল, মোটা পরদা ইত্যাদি তৈরী হয়। আট লক্ষ টন শনতন্তু বছরে ব্যবহৃত হয়, তার ৭০ শতাংশই পাওয়া যায় রাশিয়ায়।

এছাড়া আর যে সব উদ্ভিদ থেকে তন্তু উদ্ধার করে ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ; পাট, রেমি আর শিশাল। পাটের আঁশ হালকা বাদামী রংয়ের, খুব লম্বা, ঈষৎ মোটা ও লিগলিনযুক্ত। চট ও বস্তার জন্য পাট বেশী ব্যবহার হয়। মোটা কার্পেট, দড়ি, পাপোষ তৈরীতেও কিছু পাট লাগে। রেমি গাছ প্রধানতঃ চীন ও জাপানে হয়। এর কাণ্ড থেকে দেড় থেকে দুই মিটার লম্বা আঁশ ছাড়িয়ে আনা হয়।

ক্যানভাস, জাল, দড়ি, ঝাড়ন প্রভৃতি এই আঁশ থেকে তৈরী করা হয়। শিশাল গাছ আছে কিউবা, হাইতি, মেক্সিকো, ব্রাজিল, আফ্রিকা ও জাভাতে। ভারতেরও কোন কোন জায়গায় বিশেষতঃ উষ্ণ ও মরুপ্রায় (arid) অঞ্চলে শিশাল বা century plant পাওয়া যায়। ছোট ছোট ১/২ মিটার থেকে ১ মিটার আঁশ এই গাছের মোটা মোটা রসাল পাতা থেকে উদ্ধার করা হয়। পাতার চার শতাংশ এই আঁশ। মোটা শক্ত টোয়াইন সুতা এই আঁশ থেকে তৈরী হয়।

বস্তুত তুলোর এক একটি আঁশ বা তন্তু এক একটি সম্পূর্ণ কোষ যার প্রচীর সেলুলোজ দিয়ে তৈরী ; লম্বায় ৫ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। রেমি তন্তু ও তদ্রূপ, কিন্তু দৈর্ঘে অনেক বড়, ১৫ থেকে ৩০ সেমি আর রেশমের মতো উজ্জ্বল। আবার পাট, মেস্তাপাট ইত্যাদি যদিও আপাতদৃষ্টিতে অনেক লম্বা, কিন্তু এদের তন্তুকোষ ছোট, মাত্র ০·৫ সেমি আর কোষ প্রাচীরে আছে প্রচুর লিগনিন। তন্তুকোষের দৈর্ঘ, আপেক্ষিক সূক্ষ্মতা আর কোষ-প্রাচীরের সেলুলোজের পরিমাণের উপরে নির্ভর করে সুতোর সূক্ষ্মতা ও মসৃনতা। তন্তুকোষের দৈর্ঘ ঃ প্রস্থ দিয়ে সূক্ষ্মতার বিচার হয়। সেদিক থেকে রেমিই শ্রেয়। কিন্তু এর আঁশ ছাড়াবার পদ্ধতি বড় জটিল, সেই কারণে এর ব্যবহার আজও সীমিত। মোটামুটি লম্বা, সূক্ষ্ম এবং সম্পূর্ণ সেলুলোজ-যুক্ত তুলোর চাহিদাই আজও সবচেয়ে বেশী। পরিধেয় বস্ত্র তৈরীতে পাট-জাতীয় তন্তু অনাদৃত।

শুধু জামা কাপড়, পরিধেয় নয়, আরও নানা জিনিষ উদ্ভিদের কাছ থেকে আমরা নিয়ে থাকি।



॥ ৪ ॥
আশ্রয়ে উদ্ভিদের দান

খাদ্য আর পরিধেয়ের পরেই মানুষের একান্ত প্রয়োজন হল গৃহ বা আশ্রয় ; যে আশ্রয় তাকে তীব্র শীত ও উত্তাপ থেকে, ঝড় বাদল থেকে, জন্তুর আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা দেবে।

পৃথিবীর বুকে মানুষের প্রথম আবির্ভাব যখন ঘটেছিল তখন তার দুইটি সমস্যা ছিল—খাদ্য-সংগ্রহ আর হিংস্রজন্তু থেকে আত্মরক্ষা। বনজঙ্গল থেকে ফলমূল সংগ্রহ করে সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করত। পাথর ছুঁড়ে আর গাছের ডাল দিয়ে সে বন্যপশুদের আক্রমণ প্রতিহত করত। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার তার কাছে ছিল মহাবিভীষিকা, কারণ অন্ধকারে ত সে হিংস্রপশুকে দেখতে পেত না। তাই মানুষ তখন গাছের উঁচু ডালে রাত কাটাত। বৃক্ষই তখন মানুষের নিরাপদ আশ্রয় ছিল। কখনও কখনও মানুষ গাছের অনেক ডালপালা ভেঙে এনে একত্র স্তূপাকৃত করে তার ভিতরে থাকত। ঝড়ো হাওয়া, বৃষ্টি-বাদল, খানিকটা পশুর আক্রমণ থেকে এভাবে নিজেকে রক্ষা করত। এরপর মানুষ যখন অগ্নি-উৎপাদনের কৌশল আয়ত্ব করল তখন সে আগুনের সাহায্যে জন্তু-জানোয়ারদের তাড়িয়ে দিয়ে গুহাতে আশ্রয় পেল। তখন সে রাত্রিতে গুহার মুখে গাছপালাতে আগুন জ্বালিয়ে নিরাপদে গুহার মধ্যে নিদ্রা যেত। এখানেও উদ্ভিদই আগুনে পুড়ে মানুষকে নিরাপত্তা দিয়েছিল। তারও পরে মানুষ গুহার অনুকরণে মাটি আর পাথর দিয়ে আশ্রয় তৈরী করতে শিখল, উপরে দিল লতাপাতার ছাউনি। এমনি করে সুদীর্ঘ প্রস্তর যুগটা কেটেছিল। নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ অনেকটা এগিয়ে গেল, বুদ্ধির অনেক স্ফুরণ হল। নানা বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ পেল। মানুষ তখন কৃষিকাজ এবং পশুপালন করতে অভ্যস্ত হয়েছে। শন থেকে বস্ত্রবয়ন করতে শিখেছে। সারা বছরের শস্য সঞ্চয় করে রাখার জন্য মৃৎপাত্র তৈরী করেছে। যদিও এ যুগের কৃষিজীবীরা প্রায়ই ডালপালার ছাউনি দেওয়া মাটির ঘরে বাস করত তবুও খড়ের ঘরও যথেষ্ট ছিল। গত শতাব্দীতে ১৮৫৩-৫৪ সালের শীতের সময় উষ্ণতা হ্রাসের জন্য জুরিখ হ্রদের

জল অনেক নীচে নেমে গিয়েছিল। তখন দেখা গেল হ্রদের তীরে প্রাগৈতিহাসিক নব্যপ্রস্তর যুগের সম্পূর্ণ একটি বসতির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। দেখা গেল, সে যুগের মানুষ হ্রদের জলের মধ্যে বড় বড় গাছের গুঁড়ি পুঁতে তার উপরে কাঠের পাটাতন করে ঘর তৈরী করে বাস করত। এরা অবশ্যই বেশ বুদ্ধিমান ও কর্মকুশল ছিল সন্দেহ নেই। ঘরের উপরের চাল ছিল খড়জাতীয় ঘাসে ছাওয়া, অর্থাৎ সে যুগেও উদ্ভিদের সাহায্যে সম্পূর্ণ আশ্রয় তৈরী হত। নিউগিনি এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপের অধিবাসীরা এই বিংশ শতাব্দীতেও এই ধরণের বাড়ী তৈরী করে বাস করে।

নিওলিথিক যুগের মাটির ঘর বা পাতায় ছাওয়া খুঁটি দিয়ে তৈরী ঘর সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে আজ বিচিত্র সুন্দর অট্টালিকা। অপরূপ হর্ম্য আর বহুতল প্রাসাদে পরিণত হয়েছে তার ক্রমবিকাশের ইতিহাস যেমন অদ্ভুত তেমনই বিস্ময়কর। কিন্তু সেই ইতিহাস এখানে আমাদের আলোচ্য নয়, আমাদের আলোচনা আশ্রয়ের জন্য উদ্ভিদের অবদান।

আজও আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে বাঁশ বা শালগাছের খুঁটি বসিয়ে ঘর তৈরী হয় ; বাঁশের চাঁচাড়ি থেকে তৈরী দরমার বেড়া দেওয়া হয় আর খড় বা ছন (তৃণ) দিয়ে উপরের ছাউনি দেওয়া হয়। পুরোটাই উদ্ভিদ থেকে পাওয়া। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ছাতে টিন, খোলা বা টালি ব্যবহার হয়। আদিবাসীদের বাড়ীতে প্রায়ই মাটির দেয়াল থাকে, উপরে থাকে খড়ের চাল। কোন কোন সময় সরু সরু বাঁশের কঞ্চি সাজিয়ে ঘরের বেড়া হয়, তার উপর মাটির প্রলেপ থাকে। অনেক অনুন্নত দেশেই এরকম কুঁড়েঘর বা বেড়ার বাড়ী দেখা যায়।

মধ্য আফ্রিকা ও আফ্রিকার দক্ষিণাংশে অনেক জায়গায় প্রচুর লম্বা লম্বা ঘাস জন্মায়। সেখানকার লোকেরা গাছের ডাল থেকে ফ্রেম তৈরী করে তার মধ্যে ঘাসের গুছি বুনট করে ঘরের বেড়া ও ছাত বানায়। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশেও এরকম বাড়ী রয়েছে। জাপানে খুব ভূমিকম্প হয়, তাদের বাড়ী খুব হালকা হওয়া দরকার। তাদের বাড়ীর দেওয়ালগুলো প্রায়ই কাঠের বা বাঁশের ফ্রেমে কাগজ বা কাপড় দিয়ে তৈরী। উপরের ছাত তৈরী হয় সরু সরু পাতলা বাঁশের কঞ্চি জড় করে। কানাডা ও বর্মাতে প্রচুর কাঠ পাওয়া যায়, এসব দেশে অনেক বাড়ীই পুরোপুরি কাঠ দিয়ে তৈরী। নরওয়ে-সুইডেনেও অতি সুদৃশ্য এবং কারুকার্য করা কাঠের বাড়ী রয়েছে।

মালয়ের সাকাই উপজাতির লোকেরা প্রাচীনকাল থেকেই গাছের উঁচু ডালে কাঠ বা মোটা বেত বেঁধে ঘর তৈরী করে বাস করতে অভ্যস্ত ; ছাতে থাকে গোলপাতার বা পদ্মপাতার ছাউনি। বোর্নিও এবং ফিলিপাইনসের কোন কোন অঞ্চলে এরকম গাছের ডালে বাড়ী দেখা যায়। এগুলো পাখীর কথাই মনে করিয়ে দেয়। পাখীও ত গাছের কোটরে বা গাছের ডালে খড়-কুটো যোগাড় করে এনে বাসা বাঁধে।

ঘর পাথরের, মাটি বা দরমার যাই হোক না কেন, অনেক দেশেই খড় বা তালপাতার ছাউনি থাকে উপরে। সস্তার বাড়ীতে কাঠের কড়ি বরগা অনেক দেশেই ব্যবহার হয়। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই বাড়ীঘর তৈরী হত কাঠ দিয়ে, দরিদ্রেরা কুঁড়েঘরে বাস করত। আশ্রয়ের জন্য উদ্ভিদ-নির্ভরতা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ইট, লোহা, সিমেন্টের কল্যাণে স্থপতিবিদদের প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রয়োগে আজ নানা রকমের প্রাসাদ তৈরী হচ্ছে। কিন্তু বৃক্ষের উপর নির্ভর করতেই হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরজা, জানালা কাঠের তৈরী। কিছু কিছু স্টীলের দরজা-জানালা দেওয়া হচ্ছে বটে, তবে কাঠের তুলনায় তার পরিমাণ সামান্য। অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারদেরও জঙ্গলের কাঠ প্রয়োজন। আবার এসব অট্টালিকা তৈরী করার সময় ভাড়া বাঁধার জন্য চাই প্রচুর বাঁশ। কলকাতায় বহুতল বাড়ী নির্মাণে কি প্রচুর বাঁশ দরকার হয় সেটা অনেকেরই নজরে পড়ে থাকবে। এছাড়াও লাগে যথেষ্ট পরিমাণ দড়া-দড়ি।

আশ্রয় ত হল, কিন্তু বাস করতে হলে আরও ত নানা জিনিষ চাই, যেমন, খাট, পালঙ্ক, চৌকি, টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, বোর্ড, আলনা, আলমারি, র‍্যাক ইত্যাদি। প্রয়োজন হয় ঝুড়ি, বাস্কেট, ছাতা, লাঠি, পাখা ইত্যাদি—এ সবই উদ্ভিদ থেকে আসে। এমন কি ঝাঁটার কাঠিটি পর্যন্ত উদ্ভিদ সরবরাহ করে। স্টীল আর প্লাস্টিক খানিকটা অনুপ্রবেশ করছে, তবে এখনও সেটা সামান্যই। অতএব শুধু গৃহ নয়, গৃহের প্রয়োজনের অনেক কিছুর জন্যই উদ্ভিদের কাছে হাত পাততে হয়।

—::0×0::—

॥ ৫ ॥

অরণ্য সম্পদ

প্রকৃতির এত বিস্ময়কর রূপ আছে যা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, শুধু অনুভব করা যায়। বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালে তার বিশালতা আর বিস্তার, তার ফেনোচ্ছল উর্মিমালার উন্মত্ত উল্লাস, তার অবিরাম তরঙ্গাভিঘাত আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। দেবতাত্মা হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত শৈলশিখরগুলির উপরে সৌরকিরণসম্পাতে যে অপরূপ বর্ণচ্ছটা ও কল্পনাতীত বর্ণসুষমার উদ্ভব হয় তার তুলনা নেই — সে আর এক বিস্ময়কর অনুভূতি। গভীর অরণ্যও তেমনি প্রকৃতির আর এক অপরূপ প্রকাশ। দেনা-পাওনার হিসাবের খাতা বন্ধ করে, ইট-সুরকী-সিমেন্টের খাঁচা থেকে বেরিয়ে সুদূর বনপ্রান্তে গিয়ে চোখ মেলে ধরলে অপার বিস্ময়ে মন অভিভূত হয়ে পড়ে। অরণ্যের ঘন বিস্তার, তার মহীরুহ, তার তরুলতা, বিটপসম্ভার, পল্লবাশ্রিত বিচিত্র পুষ্পদল, কেমন এক আশ্চর্য্য অনুভূতি এনে দেয়। বনানীর নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, এর নীরব রহস্য এক অভাবনীয় রূপলোকের সৃষ্টি করে। বনের সবুজ শ্যামলিমা এক স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় মন ভরে দেয়। সেই সবুজের গালিচায় কোথাও রয়েছে লাল পলাশের মেলা, কোথাও গোলগুলি হলুদ ফুলের অজস্রতা, কোথাও নাম-গোত্রহীন জংলী ফুলের উজ্জ্বল অর্ঘ, আবার কোথাও শেফালী, জুঁই, টগরের খই ছড়িয়ে আছে যোজন বিস্তীর্ণ হয়ে। কোথাও নগ্নদেহ গাছের ডালে ডালে অগ্নিশিখার মত জ্বলছে রক্তবর্ণ শিমুল ফুল। প্রকৃতির অন্তরের আনন্দের বার্তা প্রকাশ করতেই সব পুষ্প যেন ব্যাকুল—আর তাদের নিঃশব্দে ঘিরে আছে সবুজ পত্রগুচ্ছ। কবিগুরুর অননুকরণীয় ভাষায়—"Leaves are silences around flowers which are their words."।[১] বনে বনে পিয়াল, মহুয়া, শাল মঞ্জরীর সুগন্ধে, পুষ্পিত পল্লবের সৌরভে মন আকুল হয়ে ওঠে। রূপে রসে গন্ধেভরা অরণ্যের তুলনা নেই।

---

১. Fire flies

মহালিখা রূপের লবটুলিয়ার জঙ্গল দেখে মুগ্ধ পথের কবি বিভূতিভূষণ লিখলেন,

"...গম্ভীর শোভা ডাঙ্গার উপরকার অরণ্যের কি ধ্যানস্তিমিত, উদাসীন, বিলাসহীন সন্ন্যাসীর মত রুক্ষ বেশ তার, অথচ কি বিরাট ! সেই অর্ধশুষ্ক পুষ্পপত্রহীন বনের নিস্পৃহ আত্মার সহিত ও নিম্নের এই বন্য বর্বর তরুনদের বসন্তোৎসবের সকল নিরাড়ম্বর প্রচেষ্টায় উচ্ছ্বসিত আনন্দের সহিত আমার মন এক হইয়া গেল ..." ।[২] আমাদের প্রাণের কাছে অরণ্যের এই আনন্দ-সংবহন এর শ্রেষ্ঠ অবদান । এই অমূল্য সম্পদ ত অর্থ দিয়ে মাপা যায় না শুধু অন্তর দিয়ে গ্রহণ করা যায় ।

সেই প্রাচীন সভ্যতার যুগ থেকেই বনবৃক্ষের সঙ্গে ভারতের মানুষের এক নিবিড় সংযোগ ছিল । সে যুগের মুণি-ঋষিরা লোকালয় থেকে দূরে গিয়ে বনাঞ্চলে আশ্রম তৈরী করে বাস করতেন । তরুণ ও কিশোর ব্রহ্মচারীর দল সেই বনপ্রান্তের গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন । উন্মুক্ত আকাশের তলে বনাবৃত গুরুগৃহে থেকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের শিক্ষার তপস্যা হত । তপোবনের এই শিক্ষার সময়ে তারা শুধু আশ্রমের স্নিগ্ধ প্রভাতকেই সামবেদগানে মুখরিত করতেন না, রৌদ্রস্নাত মধ্যাহ্ন শুধু ধর্ম ও দর্শন আলোচনাতেই অতিবাহিত হত না, তার সঙ্গে সে যুগের উপযোগী সমস্ত রকম শিক্ষার দীক্ষা নিতে হত । কৃষির-উৎপাদন, জলসেচন, সমিধ-আহরণ, নীবারধান্য সংগ্রহ, এমনি সব কাজই শিখতে হত ।

এরপরে আরও এক উন্নতযুগ এ দেশে এসেছিল—বৌদ্ধ সভ্যতার যুগ । ভগবান তথাগত বোধিদ্রুমতলে বসে সাধনা করেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন । তিনি তাঁর অমৃতবাণী কোন রাজপ্রাসাদ থেকে প্রচার করেন নি । তাঁর উদাত্তকন্ঠে ত্যাগ ও অহিংসার বাণী উচ্চারিত হয়েছে নানা বন-উপবন থেকে বেনুবন, অশোককানন থেকে । ভারতের বৈশিষ্টই ছিল প্রকৃতির কোলে থেকে, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় হয়ে জীবনের সবকিছু করা । তাই অতীত ভারতের মানুষ প্রকৃতিকে, আকাশ-নক্ষত্র, নদ-নদী, ফলফুল, বৃক্ষলতা সব কিছুকেই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে । সেইজন্যই আজকের দিনেও হিন্দুরা তুলসী, বিল্ব, কদম্ব গাছকে পবিত্র মনে করে । আজও তারা দেবতাকে দূর্বা-পল্লব, ফুল-চন্দন দিয়ে অর্চনা করে । আজও পঞ্চবটীর তলকে (অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, আমলকী, অশোক) পবিত্র বলে মনে করে ।

২. আরণ্যক

আদিম মানুষ ত প্রথম বনজঙ্গলেই আশ্রয় পেয়েছিল। বনের পশু শিকার করে, বনের ফলমূল থেকে সেই প্রাচীন মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করত। শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে বৃক্ষই তার ডাল দিয়েছিল মানুষকে তার প্রথম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে। বনজঙ্গলই সেই আদিম মানুষকে লালন করেছিল, অরণ্যই মানুষের প্রথম ধাত্রীদেবতা।

মানুষ যখন ধীরে ধীরে বসতি স্থাপন করল, চাষ আবাদ শুরু করল, তখন বনের আয়তন স্বভাবতঃই হ্রাস পেতে লাগল। বর্তমানে পৃথিবীর মোট ভূখণ্ডের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বনাঞ্চল এর পরিমাণ দেড়শ' লক্ষ বর্গ মাইল। বনজঙ্গলই বৃষ্টিকে ডেকে আনে, বনজঙ্গলই মাটির অবক্ষয় রোধ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে এর জন্য দেশের অন্ততঃ শতকরা ৩০ ভাগ বনভূমি থাকা একান্ত প্রয়োজন। উন্নত দেশগুলিতে বিশেষতঃ আমেরিকা, কানাডা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে সুষ্ঠু বনরক্ষণ ও বনসৃজন ব্যবস্থার ফলে তাদের উপযুক্ত বনভূমি রয়েছে। কিন্তু ভারতের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। প্রচুর লোকসংখ্যার জন্য অন্ন-লোলুপতায় 'বন-কেটে-বসত' করার ফলে আমাদের বনভূমি এখন ১৩ শতাংশেরও কম। দ্রুত প্রতিকার না করলে ভবিষ্যতে নিদারুণ অবস্থায় পড়তে হবে।

আমাদের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা ২৪০ আর চীনে সেই সংখ্যা হল মাত্র ১০৪। যদিও মোট লোকসংখ্যা চীনের সর্বাধিক। আমাদের প্রতি বছরে ৩০ কোটি টন কাঠ প্রয়োজন, তার মধ্যে ১৫ কোটি টন জ্বালানি। এই শতকের চারের দশকেও বনভূমি ছিল ১১ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, সেটা এখন ৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ গত চল্লিশ বছরে আমরা তিন চতুর্থাংশ বন নির্মূল করেছি। চিত্রটি ভয়াবহ।

বন বিপুল সম্পদের ভাণ্ডার। সেখান থেকে যেসব সম্পদ আমরা পাই তার মধ্যে প্রধান হল কাঠ। জ্বালানি হিসাবে, আসবাব-পত্র তৈরীতে, গৃহনির্মাণে, রেল লাইন বসাতে, কাগজ প্রস্তুতিতে, বাক্স তৈরী করতে, আরও অসংখ্য প্রয়োজনে কাঠ ব্যবহৃত হয়।

সেই যেদিন মানুষ প্রথম আগুনের সন্ধান পেয়েছিল সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। জ্বালানিতে কয়লার ব্যবহার এসেছে মাত্র তিন শতক আগে আর পেট্রোলিয়াম মাত্র একশ বছর আগে। এখনও অনেক দেশে, বিশেষতঃ যাদের কয়লা নেই, জঙ্গলের কাঠই তাদের জ্বালানি। আমাদের দেশেও গ্রামাঞ্চলে, বিশেষতঃ আদিবাসী

অধ্যুষিত অঞ্চলে, কাঠের জ্বালানিই সম্বল। এ দেশে বাব্‌লা, বাঁদরলাঠি, শিশু, শাল, সুন্দরী, খয়ের, ঝাউ এসব গাছ জ্বালানির জন্য ব্যবহার হয়। এসব গাছ অন্য প্রয়োজনেও লাগে। সাধারণতঃ যে সব গাছ থেকে তক্তা হয় না, বড় গাছের ডালপালা ঝোপঝাড় এসব জ্বালানিরূপে পোড়ানো হয়। কয়লার তুলনায় কাঠের তাপ উৎপাদন ক্ষমতা অনেক কম। কাঠে শতকরা ৫০ ভাগের বেশী কার্বন থাকে না। প্রতি পাউন্ড কাঠ থেকে আনুমানিক ৮০০০ BTU তাপ পাওয়া যায় (এক BTU তাপ দিয়ে এক পাউন্ড জলের 1°F উষ্ণতা বাড়ানো যায়)। জ্বালানি কাঠের উৎপাদন সবচেয়ে বেশী রাশিয়াতে, তারপরের স্থান যথাক্রমে কানাডা ও আঃ যুক্তরাষ্ট্র। জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন মেটাতে আমাদের দেশে আজকাল সোনাঝুরি, ইউকেলিপটাস প্রভৃতি দ্রুত-বর্ধনশীল গাছ লাগিয়ে সামাজিক বন-সৃজনের প্রচেষ্টা চলছে।

ঘরের খুঁটি, টেলিগ্রাফের পোষ্ট, লাইট-পোষ্ট, নরম মাটির পাইলিং, নদী তীরের বাঁধ, ইত্যাদিতে গাছের কাণ্ড সরাসরি ব্যবহার করা হয়। কখনও অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও হালকা গাছের কাণ্ডের মধ্যে গর্ত কুঁদে নিয়ে ছোট্ট ডোঙ্গা নৌকো তৈরী হয়। পরপর গাছের কাণ্ড সাজিয়ে নিয়ে পাটাই করে ভেলা তৈরী করা হয়। কাশ্মীরের ডাল হ্রদের ভাসমান বাগানগুলির তলায় এমনি গাছের পাটাতন রয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য বিরাট সব দারুবৃক্ষ চেরাই করে প্রয়োজনীয় মাপের কাঠ বের করে লওয়া হয়। নানা প্রয়োজনে আমাদের যে সব কাঠ লাগে, সেগুলি প্রধানতঃ দু'রকমের ; (১) মৃদুকাঠ (soft wood) আর (২) শক্ত কাঠ (hard wood)।

মৃদুকাঠ অপেক্ষাকৃত নরম, সহজে কাটা যায়। সুমেরুবৃত্তের কাছাকাছি অঞ্চলে, যেমন আলাস্কা, কানাডা, স্কাণ্ডিনেভিয়া, রাশিয়ার উত্তরাংশ, সাইবেরিয়াতে বিস্তীর্ণ মৃদুকাঠের জঙ্গল (soft wood forest) রয়েছে। পাইন, ব্রুস, সিডার, ডগলাস ফার (Douglas fir) প্রভৃতি চিরহরিৎ মোচাকৃতি এই সব গাছ থেকেই মৃদুকাঠ সাধারণতঃ সংগ্রহ হয়। এদের পাতাগুলো প্রায়ই সরু সূচের মত। পাতা ঝড়ে পড়ে না। অন্যান্য দেশেও বিশেষতঃ পাহাড়ী অঞ্চলে, যেমন আল্পসে, আসামে, হিমালয়ের পাদদেশেও যথেষ্ট পাইনজাতীয় গাছ হয়। কোন কোন মৃদু-কাঠের জঙ্গল থেকে বেশ শক্ত কাঠও পাওয়া যায়। পাইন গাছ যেমন দীর্ঘ হয় তেমনি দীর্ঘজীবীও হয়। ২০০—২৫০ ফুট উঁচু পাইন গাছ প্রচুর দেখা যায়।

আবার চার হাজার বছরের পুরাণো পাইন গাছও আছে। পাইনের কাঠ বাড়ীঘর তৈরী করতে ব্যবহার হয়। ভাল ফ্রেম হয়। পাইনের নির্যাস থেকে তার্পিন তেল পাওয়া যায়। বার্চ গাছের ছাল সহজেই আলাদা করে নেয়া যায় এবং কাগজ হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব।

উত্তর গোলার্ধের হাজার হাজার বর্গমাইল ব্যপে রয়েছে শক্ত কাঠের অরণ্য (hard wood forest)। এসব অঞ্চলে বিশাল মহীরূহ সব জন্মায় ; যেমন, ওক, বীচ, বার্চ, ম্যাপল, পপলার ইত্যাদি। এসব গাছের পাতাগুলো বড় এবং প্রশস্ত হয়। প্রতি বছরেই গাছ থেকে সব পাতা শীতের সময় ঝড়ে পড়ে যায় ; অনেক বৃক্ষ তখন পত্রহীন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বসন্তে আবার নতুন পাতা গজায়। এই সব অঞ্চলে কিছু কিছু মৃদু কাঠের গাছও একত্র দেখা যায়। উত্তর আমেরিকা, মধ্য ইউরোপ, এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে শক্ত কাঠের বন বেশী রয়েছে। ওক কাঠ ইউরোপ ও আমেরিকাতে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। ওক সুদৃশ্য, যথেষ্ট শক্ত এবং নানাকাজের উপযুক্ত। আর একটি ভাল কাঠ ম্যাপল, এর শক্তি কাঠিন্যের জন্য ভারী কাজে এবং ভাল আসবাবপত্রে ব্যবহার হয়। বীচ কাঠ ঈষৎ লালচে কাঠ, ম্যাপলের মতই শক্ত কিন্তু বেঁকে যাবার প্রবণতা রয়েছে। চেরী কাঠ গাঢ় লালচে, ক্যাবিনেটের জন্য সমাদৃত। বার্চ কাঠ সাদাটে এবং ভাল ও শক্ত। রেডউড কাঠ বাজনার যন্ত্রাদির জন্য যথেষ্ট ব্যবহার এবং খুব দামী। আরও শত শত রকমের শক্ত কাঠ বিভিন্ন প্রয়োজনে লাগে।

বিষুবরেখার সন্নিহিত অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাত যথেষ্ট এবং তাপমাত্রাও বেশী সেখানকার গভীর জঙ্গলেও (tropical rain forest) অসংখ্য রকমের শক্ত কাঠের গাছ আছে। এসব গাছের পাতাও খুব বড় এবং কিছু কিছু পাতা ঝরে গেলেও নতুন পাতা তার স্থান লয়। গাছ কখনও ন্যাড়া হয়ে পড়ে না। ভারতবর্ষ, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ফিলিপাইন, মধ্য-আফ্রিকার দক্ষিণাংশ, মধ্য-আমেরিকা, দক্ষিণ-আমেরিকার উত্তরাংশে এই অরণ্য বিস্তৃত। সংখ্যাতীত দারুবৃক্ষ এইসব জঙ্গলে জন্মায়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল সেগুন (teak), মেহগনি, দেবদারু, সাইপ্রেস, বালসা ইত্যাদি। চার হাজারেরও বেশী রকমের গাছ চিহ্নিত হয়েছে, তার মধ্যে ভারতে আড়াই হাজারেরও বেশী রয়েছে। সেগুন ও মেহগনি পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম কাঠ। থাইল্যাণ্ড, বর্মা ও ভারতে সেগুন কাঠ পাওয়া যায়। বর্মার সেগুন উত্তম। সেগুন কাঠ শক্ত হলেও কাটা সহজ এবং এই কাঠ পোকায় কাটে না।

রোদে জলে বেঁকে যায় না। তাই সব ভাল কাঠের জিনিষের জন্য সেগুন পছন্দ করা হয়। আসবাব-পত্র, ক্যাবিনেট, সিঁড়ি প্রভৃতির জন্য মেহগনি কাঠ সর্বোত্তম। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মেহগনি সবচেয়ে ভাল। ক্রীম রংয়ের বালসা কাঠ অত্যন্ত হালকা অথচ মজবুত। সমস্ত রকম কাঠের কথা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এখানে আমাদের দেশে সর্বদা ব্যবহৃত আরও কয়েকটি কাঠের কথা বলা হচ্ছে।

পশ্চিম হিমালয়ে যথেষ্ট দেবদারু গাছ জন্মায়, ঘর-বাড়ীর কাজে লাগে। পুলের জন্য এবং রেলের স্লীপারে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। অত্যন্ত উঁচু এবং সরল এই গাছ। হিমালয়ের একটু উঁচু স্তরে রয়েছে চিরহরিৎ "সিলভার ফারের" জঙ্গল। সস্তা টেবিল, জানালা, দরজা ও কাঠের বাক্স (প্যাকিং কেস) ইত্যাদি তৈরী হয়, সাদা রঙের মৃদু কাঠ। আর একটি চিরহরিৎ শাখা প্রশাখাযুক্ত বিরাট গাছ হল দার্জিলিং, সিকিম, আসাম অঞ্চলের চেস্টনাট (chestnut)। পাহাড়ী অঞ্চলে এই কাঠ থেকে খুঁটি, বরগা, মেঝের পাটাতনের তক্তা তৈরী করা হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শালবন রয়েছে। শালকাঠ শক্ত, টেঁকসই ও ভারসহ। কড়ি, বরগা, খুঁটি, নৌকা, গাড়ীর চাকা, দরজা-জানলার চৌকাঠ, মাস্তুল, দাঁড়, ইত্যাদি বহু কাজে ভারতে শাল ব্যবহার হয়ে থাকে। এসব কাজের জন্য আরও শক্ত এবং ভারী পিয়াশালও অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বকুল, নাগেশ্বর, আম, জাম, কাঁঠাল, প্রভৃতি গাছের কাঠ সাধারণ জিনিষের জন্য উপযুক্ত। হিমালয়ের সানুদেশে সর্বত্র শিশুগাছ রয়েছে—অশ্বত্থ গাছের মত ছোট ছোট পাতা। এর কাঠ শক্ত, টেঁকসই এবং সুদৃশ্য। আসবাব, গাড়ীর চাকা, খোদাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়। মধ্য ভারতে কালো আবলুশ কাঠ পাওয়া যায়—অত্যন্ত ভারী। খেলনা, ছড়ি, খোদাইয়ের কাজের পক্ষে উপযুক্ত। কর্ণাটকের চন্দন গাছ থেকে মূল্যবান কাঠ ও তেল সংগ্রহ হয়। যেসব গাছ জ্বালানিরূপে ব্যবহার হয় তার কথা আগেই বলা হয়েছে।

পৃথিবীর সমস্ত অরণ্য থেকে বছরে আটশ কোটি ঘনফুট মৃদু কাঠের তক্তা, দু'শ' কোটি ঘনফুট শক্ত কাঠের তক্তা এবং চল্লিশ কোটি ঘনফুট প্লাই-উড তৈরী হয় আমাদের নানা প্রয়োজনে। এ ছাড়া অনেকটা কাঠের গুঁড়ো এবং ছোট ছোট কাঠ ব্যয় হয় কাগজের মণ্ড তৈরীতে।

নানারকম কাজে কাঠ সরাসরি ব্যবহার করা হয় ; যথা,

(১) বাড়ির দরজা, জানালা, কড়ি, বরগা, রেলিং, মেঝে ও দেওয়ালের পাটাতন বা পানেলিং ইত্যাদি।

(২) খাট, পালঙ্ক, চৌকি, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, বইয়ের শেল্ফ, আল্না, বাক্স, ছোট বড় প্যাকিং কেস (চা, ফল, চুরুট ইত্যাদির জন্য) এবং আরও আসবাবপত্র।

(৩) রেললাইনের স্লীপার, রেলের কামরার নানা অংশ। জাহাজ, নৌকো, নৌকোর নানা সরঞ্জাম, যেমন, মাস্তুল, দাঁড়, হাল, পাটাতন।

(৪) গরুর ও ঘোড়ার গাড়ী।

(৫) কৃষি কাজে—লাঙল, মই, ঘানি, ঢেঁকি, দা ও কাস্তের হাতল, বাঁক, পিপে, তাঁত।

(৬) দেশলাইয়ের বাক্স ও কাঠি; পেন্সিল, কলম, স্কেল, অনেক বাদ্যযন্ত্রের অংশ।

(৭) ধনুক, তীর, ছিপ, বন্দুকের হাতল, ছড়ি-লাঠি, চিরুণী।

(৮) ক্রিকেট, হকি, টেনিস ইত্যাদি খেলার সরঞ্জাম।

(৯) কারুকাজ—মূর্তি, বাকস, ছবির ফ্রেম, বাটি, থালা, চামচ, খেলনা ইত্যাদি।

কোন প্রয়োজনে কতটা কাঠ ব্যবহার হয় তার একটা গড় হিসাব করা হয়েছে। দেখা যায়, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বাড়ীঘর তৈরীতে ৩৩% কাঠ ব্যয় হয়। পরিবহনে—রেল গাড়ী, লরি-বাস, জাহাজ প্রভৃতির জন্য ব্যয় হয় ১০%। আসবাব-পত্র, ক্যাবিনেট (টিভি, রেডিও ইত্যাদি), অন্যান্য ফার্নিচারের জন্য ১৭% কাঠ খরচ হয়। প্যাকিং বাক্স, ক্রেট, রপ্তানীর ব্যবস্থায় প্রায় ২০% কাঠ লাগে।

যেসব প্রয়োজনে কাঠ সরাসরি ব্যবহার হয় তার কথা বলা হল। কিন্তু কাঠ থেকে আরও অনেক জিনিষ উৎপাদন করা হয়, তার মধ্যে প্রধান হল কাগজ। বর্তমান সভ্যতার মাপকাঠি ত হল কাগজের ব্যবহার। যে দেশে জন প্রতি কাগজ বেশী খরচ হয় সে দেশ বেশী উন্নত।

কাগজ ঃ প্রাচীন মিশরে নীল নদের ধারে অনেক নলখাগড়ার বন ছিল। এই নল থেকে লম্বা পাত্‌লা পাত্‌লা পাত কেটে নিয়ে চাপ দিয়ে বেশ প্রশস্ত সীট তৈরী করা হত। এর নাম ছিল প্যাপিরাস (papyrus);

এর উপর লেখা হত। এই প্যাপিরাস থেকেই কাগজের ইংরেজী নাম পেপার হয়েছে। প্রাচীন ভারতেও ভূর্জবৃক্ষের মৃদুত্বক ছাড়িয়ে নিয়ে সমান করে কেটে লেখার জন্য ভূর্জপত্র তৈরী হত। পরবর্তী কালে তালপাতার টুকরো সমান করে কেটে নিয়ে তার উপর লেখা হত। সেই পাতাগুলোর মাঝখানে ছিদ্র করে পর পর গেঁথে তালপাতার পুঁথি হত। এখনও কোন কোন প্রাচীন টোলে বা যাদুঘরে তালপাতার পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়।

বর্তমানে আমরা যে কাগজ ব্যবহার করি সেটা তৈরী হয় কাঠ, বাঁশ, শন, করাতের গুড়ো, কোন কোন ঘাস, গমের বা ধানের খড় ইত্যাদি থেকে। পুরানো কাপড় (rags) পাওয়া গেলে সেটাও মিশানো হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় কাগজ তৈরীর জন্য প্রধানতঃ কাঠ ব্যবহার হয়। পাইন, পপলার, স্প্রুস, ফার, হেমলক এবং কিছু কিছু শক্ত গাছের কাঠই এ কাজে ব্যবহার হয়, কিছুটা শনও ব্যবহার হয়। আমাদের দেশে কাগজ তৈরী হয় সচরাচর বেনু-বাঁশ, মুলি বাঁশ, করাতের গুড়ো, ও ঘাস থেকে।

কাঠ, বাঁশ ইত্যাদিতে প্রধানতঃ সেলুলোজ থাকে, তার সঙ্গে মিশ্রিত থাকে বাদামী বা খয়েরী রঙের আঠাল জিনিষ, লিগনিন। কাগজ শুধু সেলুলোজের তৈরী। সুতরাং কাঠ ও বাঁশ থেকে লিগনিনকে পৃথক করে নিতে হয়। লোহার ট্যাঙ্কে কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি কুচি কুচি করে কেটে নিয়ে ক্যালসিয়াম বাইসালফাইট অথবা কষ্টিক সোডার দ্রবণের সঙ্গে উচ্চচাপ ও উষ্ণতায় পরিপাক করলে লিগনিন পৃথক হয়ে যায়। আর জলে শ্বেতশুভ্র সেলুলোজের একটি মণ্ড পাওয়া যায়। বারবার ভাল করে ধুয়ে নিয়ে এই মণ্ডকে উষ্ণ স্টীম রোলারের চাপের মধ্যে পরিচালনা করলে প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ সেলুলোজ সীট অর্থাৎ কাগজ বেরিয়ে আসে। শতাধিক রকমের কাগজ আমাদের নানা প্রয়োজনে লাগে। নোট, চেক, দলিল তৈরীর কাগজ, লেখার কাগজ, বই ছাপা ও পত্রিকা ছাপার কাগজ, সিগারেটের কাগজ ও প্যাকিংয়ের কাগজ, ফটোর কাগজ, ছবি আঁকার কাগজ—এমনি নানা ধরনের কাগজের জন্য মণ্ডের সঙ্গে স্টার্চ, ক্যাওলিন, আটা, নীল রঙ (marine-blue) ইত্যাদি মিশিয়ে নিতে হয় ; প্রস্তুত প্রণালীরও তারতম্য আছে। সবচেয়ে বেশী কাগজ উৎপাদন করে আঃ যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৪৫০ লক্ষ টন আর তারপরেই কানাডা প্রায় ১২০ লক্ষ টন। আমাদের দেশে যে কাগজ তৈরী হয় তাতে কুলোয় না, তাই বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়।

চেয়ারে বসে টেবিলের উপরে খাতা রেখে এ কাহিনী লিখছি, কিন্তু

চেয়ার, টেবিল ও খাতার কাগজ সবই যে উদ্ভিদের দান একথা কি সহসা মনে আসে !

দারুজাত দ্রব্য : রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাঠকে বিভাজিত করেও প্রয়োজনীয় কয়েকটি জৈবপদার্থ প্রস্তুত করা হয়। বড় বড় আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে কাষ্ঠখন্ড ভরে নিয়ে বাতাসের অনুপস্থিতিতে খুব উত্তপ্ত করা হয়। বাতাস নেই তাই কাঠ-পুড়ে যায় না। উত্তাপে কাঠ বিভাজিত হয়ে পড়ে এবং প্রচুর উদ্বায়ী পদার্থ প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে। প্রক্রিয়ার শেষে ২৫ শতাংশ 'কাঠ কয়লা' পড়ে থাকে। কাঠকয়লা অবশ্য জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। বাতাসের অবর্তমানে এইরূপ বিভাজন প্রক্রিয়াকে বলা হয় অন্তর্ধূম-পাতন। যে উদ্বায়ী গ্যাস বের হয়, শীতল করলে তার প্রায় ৫০ শতাংশ তরল হয়ে একটা ট্যাঙ্কে জমে। এই তরলের নীচের অংশ আলকাতরা জাতীয় পদার্থ (wood-tar) আর তার উপরে থাকে জলীয় পদার্থ। এই জলীয় পদার্থটির নাম পাইরোলিগনিয়াস অ্যাসিড-এর মধ্যে রয়েছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা ভিনিগার, মিথাইল অ্যালকোহল আর অ্যাসিটোন। এই তিনটিই যথেষ্ট মূল্যবান এবং এদের থেকে প্রচুর প্রয়োজনীয় জৈবপদার্থ তৈরী করা যায়। অতএব বনজ কাঠ থেকে কাঠকয়লা, আলকাতরা (কাঠ), অ্যাসিটিক অ্যাসিড, মিথাইল অ্যালকোহল ; অ্যাসিটোন, উড-গ্যাস পাওয়া যায়।

বল্কল : নানা কাজের জন্য কাঠ সংগ্রহ করার সময় গাছের ছাল সাধারণতঃ ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু কোন কোন বৃক্ষ-বল্কল থেকে মূল্যবান পদার্থ পাওয়া যায়। কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে :—

১। সিনকোনার ছাল থেকে কুইনিন পাওয়া যায়। ২। দারুচিনির বল্কলই ত মশলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ৩। বাবলা, গড়ান, হরিতকী গাছের ছাল থেকে চামড়া ট্যান করার জন্য ট্যানিন সংগ্রহ করা হয়। ৪। চেরী গাছের বল্কল থেকে "কফ মিকশ্চার" তৈরী হয়। ৫। একরকম ওক গাছের (**cork oak**) আবরণ থেকে কর্ক পাওয়া যায়। ৬। কাঞ্চন, উদাল প্রভৃতি গুল্ম ও লতার ছাল থেকে দড়ি তৈরী হয়।

এমনি বনজ উদ্ভিদ থেকে বহু রকমের ওষুধ তৈরী করা হয়। সেকথা পরের অধ্যায়ে বলা হবে।

পাতা : এ দেশের দরিদ্র মানুষের ধূমপানের ব্যবস্থা বিড়ি থেকে। এই বিড়ি বাঁধবার জন্য যে গাছের পাতা ব্যবহার হয়, তার নাম (**Diospyros melanoxylon Roxb.**)। অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশের জঙ্গলে

এই বিড়িপাতার গাছ প্রচুর। কখনও কখনও শালপাতাও ব্যবহার হয়। কিন্তু সেটা ভাল নয়। পুড়লে একটা কটু গন্ধ হয়। এই পাতা সংগ্রহ করে উপজাতিদের অনেকে জীবিকার ব্যবস্থা করে। ভারতে আনুমানিক ৩ লক্ষ টন বিড়ি পাতা সংগৃহীত হয়। অষ্ট্রেলিয়া, আফগানিস্থান, দুবাই, বাহেরিন, নাইজেরিয়া, নেপাল, সিঙ্গাপুর, ডেনমার্ক, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে বিড়ি রপ্তানি হয়। গড়ে বছরে দেড় কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায়।

বাঁশ, বেত, ঘাস : কাঠ ছাড়াও অন্যান্য বনজ উদ্ভিদ আমাদের কাজে লাগে। উচ্চ নিরক্ষরেখা অঞ্চলের জঙ্গলে সচরাচর বাঁশ প্রচুর পাওয়া যায়। কয়েকশ' বিভিন্ন রকমের বাঁশ আছে। দার্জিলিংয়ের জঙ্গল ৭০-৮০ ফিট উঁচু এবং মাটি থেকে দু'হাত উপরে ১ ফুট ব্যাসের বাঁশ প্রায়ই দেখা যায়। 'তল্‌দা বাঁশ' আমাদের দেশে সাধারণতঃ ব্যবহার হয় সেইজন্য অনেক গ্রামেই এই বাঁশের ঝাড় রোপিত হয়। আবার বাংলাদেশ, আসাম, জাভা, মালয় প্রভৃতি দেশে অপেক্ষাকৃত সরু ১৫।১৬ ফুট উঁচু বাঁশ অনেক জন্মায়। ঘরের খুঁটির জন্য এবং দালান তৈরীর সময়, ভাড়া বাঁধার জন্য বাঁশ প্রয়োজন হয়। বাঁশের চালি (rafe) অনেক ব্যবহার হয়। বাঁশের চাঁচাড়ি থেকে ঘরের বেড়া, বাগানের বেড়া হয় ; আবার চেয়ার, বাস্কেট, পাখির খাঁচা, ধামা, ঝুড়ি, কুলো, চাল্‌নি ইত্যাদি তৈরী হয়। বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরী খাট, চৌকিও কোন কোন অঞ্চলে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। চিত্রিত সুদৃশ্য চিক, পরদা বাঁশের খুব পাতলা সরু সরু ফালি দিয়ে তৈরী হয়। মাদুর ও টেবিল-ম্যাটও হয়।

জঙ্গলে বেতগাছও যথেষ্ট দেখা যায়। মালয়ের বেত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে অত ভাল বেত পাওয়া যায় না। বেত চেয়ারের সীটে ব্যবহার হয়। বেতের চেয়ার, বাস্কেট, ঝুড়ি ও মোড়া প্রভৃতি তৈরী হয়। পাটির জন্য ভাল বেত প্রয়োজন হয়। বেতের সুদৃশ্য ও মজবুত লাঠির যথেষ্ট চাহিদা।

সব জঙ্গলেই ছোট বড় নানা রকমের ঘাস জন্মায় অনেকটা জায়গা জুড়ে। কোন কোন লম্বা ঘাস এবং খড় ঘর ছাইতে ব্যবহার হয়। ঘাসের গুছি বেঁধে কখনও কখনও ঘরের বেড়াও দেওয়া হয়। ঘাস থেকে ডালা, ধামাও তৈরী হয়। ভারতবর্ষে সাবাই ঘাস হয় বেশী, সেটা থেকে কাগজের মন্ড তৈরী হয়। লেমন ঘাস থেকে সুগন্ধী তেল নিষ্কাশিত করে নেওয়া হয়। তাল জাতীয় গাছের পাতা থেকে পাখা তৈরী হয়।

বনজঙ্গল থেকে কিছু তেল, রঞ্জক, আঠা, ইত্যাদিও সংগ্রহ করা হয়। দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মহুয়ার তেল প্রদীপের জন্য এবং সাবান তৈরীর জন্য ব্যবহার হয়। গর্জন গাছের তেল মশালে ও বার্নিশের কাজে লাগে। পাইন গাছ থেকে যে রেজিন বের হয়, তা থেকে তার্পিন তেল উদ্ধার করা হয়। তার্পিন তেল ওষুধে ও বার্নিশের কাজে প্রয়োজন হয়। অগুরু কাঠ থেকে আতর এবং চন্দন কাঠ থেকে সুগন্ধি তেল পাওয়া যায়। খয়ের কাঠ সেদ্ধ করে যে ক্বাথ তৈরী হয় তাতে খয়ের ত থাকেই, তা ছাড়া মাছ-ধরা জাল এবং চট বার্নিশ করার জন্য কালো ঘন তেল পাওয়া যায়। জঙ্গলের করঞ্জা, চালমুগরা প্রভৃতি থেকে ওষুধে ব্যবহৃত তেল সংগ্রহ করা হয়।

মঞ্জিষ্ঠা লতা অনেক জঙ্গলেই আছে। এর শেকড় থেকে লাল রঙ উদ্ধার করা হয়। অনেক গামছাতে মঞ্জিষ্ঠা ব্যবহার হয়। কাঠাল গাছের হলুদ রঙ দিয়ে সাধু-সন্নাসীদের গৈরিক বস্ত্র রঞ্জিত করা হয়। শাল, পিয়াশাল ইত্যাদি গাছ থেকে বাদামী রঞ্জক পাওয়া যায়।

কতকগুলি গাছ থেকে আঠাল জিনিষ বেরিয়ে আসে। বিশেষতঃ যদি কাণ্ডে আঘাত লাগে-এদের বলা হয় 'রেজিন'। যেমন, ঘৃত কুমারী (aloe), হিঙ্গ (asafoetida), ম্যাঁর (myrrh) প্রভৃতি গাছের রেজিন প্রায়ই পাওয়া যায়। সুগন্ধি কোন কোন ব্যালসাম (balsam) গাছেও আঠা থাকে। আমাদের দেশে জিওল, বাব্‌লা, পলাশ, বিজাশাল প্রভৃতি গাছ থেকে রেজিন সংগৃহীত হয়। আঠা সাধারণতঃ জিনিষ জুড়তে, কাগজ শিল্পে, বস্ত্ররঞ্জনে এবং ওষুধে প্রয়োগ করা হয়। ধূপের ধুনোও উদ্ভিদজাত রেজিন। পাইন-রেজিন থেকে তার্পিন তেল তৈরীর করার পর একটি আঠাল অবশেষ পড়ে থাকে তার নাম রোজিন (rost)। সাবানে, বাদ্য যন্ত্রের পালিশের কাজে, বেকেলাইটে, কাগজে এটি ব্যবহৃত হয়।

বনজঙ্গল থেকে কয়েকটি প্রাণিজ বস্তু আমরা পাই। এরা উদ্ভিদজাত নয়। এগুলোর উৎপাদনে উদ্ভিদ পরোক্ষে সাহায্য করে ; যেমন মধু ও মোম, রেশম, গালা ইত্যাদি।

দেখা যাছে বনসম্পদ প্রচুর মূল্যবান। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর এর প্রভাব যথেষ্ট।

—::O::—

॥ ৬ ॥

উদ্ভিদ ও ওষুধ

পৃথিবীর ইতিহাসে রোগ নিরাময়ে সুসংবদ্ধ চিকিৎসা পদ্ধতি সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়েছিল ভারতবর্ষে। খৃষ্টজন্মের কয়েক শতক আগেই ভারতের আয়ুর্বেদশাস্ত্র যথেষ্ট উন্নত অবস্থায় পেঁাছেছিল। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় যে সকল ওষুধ ব্যবহার হত তার শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী ছিল উদ্ভিদজাত। কিছু কিছু খনিজ এবং প্রাণিজ ওষুধ ছিল। বুদ্ধের সমসাময়িক অর্থাৎ খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে জীবক নামে এক প্রথিতযশা বৈদ্য ছিলেন। তিনি প্রাচীন তক্ষশীলার এক প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদাচার্য আত্রেয়ের নিকট বৈদ্যক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। জীবক এবং তাঁর সতীর্থেরা বহু বৃক্ষ লতা গুল্ম প্রভৃতির ভেষজ ধর্ম পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হলে গুরু আত্রেয় জীবককে বললেন; 'বৎস, তক্ষশিলার চারদিকে যোজন পর্যন্ত অনুসন্ধান কর এবং এমন সব উদ্ভিদ সংগ্রহ করে নিয়ে এসো যার কোন ভেষজ ধর্ম নেই।' অনেক-দিন ধরে তন্নতন্ন করে খুঁজে জীবক শূন্য হাতে গুরুকে এসে নিবেদন করলেন যে কোন ভেষজ ধর্ম নেই এমন উদ্ভিদ সে দেখে নি। গুরু সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সার্থক হয়েছে, তুমি এবার দেশে ফিরে যাও"।[১]

বিভিন্ন রোগের উপশমের জন্য নানারকম উদ্ভিদের ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন ছিল সে যুগে। ভিষকাচার্যগণ সাধারণতঃ উদ্ভিদজাত ওষুধের ব্যবস্থাই দিতেন এবং সাধারণ লোকেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তারপর কত শতাব্দী কেটে গেছে, কিন্তু সেই প্রাচীন ধারনা ও ব্যবস্থা সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। আজও সাধারণ পল্লীবাসীরা জানে, তুলসী আর বাসকপাতার রস সর্দিজ্বরের ওষুধ, চিরতা আর কোয়াসিয়া ক্রিমির ওষুধ, ত্রি-ফলা আর ইসব-গুল বিরেচক, কালমেঘ আর কুরচি পেটের গোলমালের প্রতিবিধান করে। নিম আর হলুদ বীজানুবারক, দুর্বা আর গাঁদার পাতা রক্তক্ষরণ বন্ধ করে।

১। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চা—রমেশচন্দ্র মজুমদার।

বর্তমানের এলোপ্যাথি ও অন্যান্য চিকিৎসা সত্ত্বেও এরকম অনেক গাছগাছড়ার ওষুধ আজও বহুল ব্যবহৃত। সাধারণ লোকেও জানে সর্পগন্ধা উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ, ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কুইনিন, কন্টিকারি বুকের বেদনা ও হাঁপানির ওষুধ, পিপুল কাশি বন্ধ করে—এমনি অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। শ্রদ্ধেয় আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য মহাশয়ের "চিরঞ্জীব বনৌষধি' গ্রন্থাবলীতে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে।

আধুনিক এলোপ্যাথিক চিকিৎসাতে ডাক্তারেরা অবশ্যই অনেক রকম খনিজ লবন, অম্ল ও ক্ষার ব্যবহার করেন এবং ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত নানারকম জৈবযৌগের ব্যবস্থাপত্র দেন। কিন্তু তার সঙ্গে অসংখ্য উদ্ভিদজাত ঔষধও ব্যবহার করেন। "সিরাপ-অব-বাসক" অথবা 'এক্‌স্ট্রাক্ট-অব-কালমেঘ' ইত্যাদি ও আয়ুর্বেদীয় ওষুধের নবরূপায়ন মাত্র। তাছাড়া কুইনিন, স্ট্রিকনিন, মরফিন, পাইলোকার্পিন প্রভৃতি অবক্ষার তাদের নিদানে রয়েছে—এরা ত উদ্ভিদ জাত। ইপিকাক, বেলেডোনা, অ্যাকোনাইট, ডিজিটেলিস, হায়োসায়ামাস্ ইত্যাদি বহু আধুনিক ওষুধই উদ্ভিদ থেকে পাওয়া।

আজকাল পেনিসিলিন এবং নানারকম মাইসেটিন, যথা ক্লোরোমাইসেটিন জাতীয় ঔষধ অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবানুনাশক রূপে সর্বদা প্রচুর ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সকলের উৎস কিন্তু নানারকমের ছত্রাক বা mould। অর্থাৎ এসব জীবাণুনাশকও উদ্ভিদজাত। সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এবং রোগ-উপশমের জন্য অনেকাংশেই আমাদের উদ্ভিদ-নির্ভর হতে হয়।

অনেক উদ্ভিদে আবার বিষও থাকে। সক্রেটিসকে মৃত্যুবরণের জন্য যে বিষ দেওয়া হয়েছিল, সেটা হেমলক গাছ থেকে পাওয়া। ধুতুরা, কুঁচ, আফিং (পপি) কোন কোন ছত্রাকে মারাত্মক বিষ থাকে। মরফিন প্রভৃতি অল্পমাত্রায় উপকারী বটে, কিন্তু একটু অধিক মাত্রায় তীব্র বিষের কাজ করে।



॥ ৭ ॥

উদ্ভিদ ও পণ্যশিল্প

বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার জন্য দেশে দেশে নানা পণ্যশিল্প ও ব্যবসা গড়ে ওঠে। এসব শিল্পকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। (১) কতগুলি শিল্প কোন উদ্ভিদজাত পদার্থের উপর নির্ভর করে না, যেমন লোহা, সিমেন্ট, সালফিউরিক অ্যাসিড, রাসায়নিক পদার্থ (Chemicals), চুণ, কাচ, পেট্রোলিয়াম, ইত্যাদি। (২) আবার অধিকাংশ শিল্পই প্রাকৃতিক বা কৃষিজাত উদ্ভিদের উপর মূলতঃ নির্ভরশীল। যেমন খাদ্য-উৎপাদন, বস্ত্র, চা, চিনি ইত্যাদি। বস্তুতঃ এই উদ্ভিদ-নির্ভর শিল্পগুলির পরিমাণ অপর শ্রেণীর শিল্প ব্যবসায়ের তুলনায় অনেক বেশী। আর এর মধ্যে খাদ্যের স্থান সর্বোচ্চ। এখানে কয়েকটি এরকম শিল্পের উল্লেখ করা হল।

১। **খাদ্য :** খাদ্য-উৎপাদনই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যের জন্যই দেশের অর্থসম্পদের সর্বাধিক অংশ বিনিয়োগ করা হয় এবং সর্বাধিক লোকও এর সঙ্গে জড়িত। এই খাদ্যের খানিকটা প্রাণিজ (দুধ, ঘি, মাংস ইত্যাদি) কিন্তু সিংহভাগই উদ্ভিদজাত (ধান, গম, আলু, ডাল, আখ, সরষে ইত্যাদি)। অর্থাৎ সর্বপ্রধান পণ্য শিল্পটি উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে।

আমাদের কৃষি প্রধান দেশের শতকরা প্রায় ৭০ শতাংশ লোক কৃষিকাজে এবং খাদ্য সরবরাহ ও বন্টনে নিযুক্ত। আমাদের দেশের প্রধান খাদ্যগুলির উৎপাদনের পরিমাণের ধারণা নীচের তালিকা থেকে পাওয়া যাবে।

উৎপাদন (লক্ষ টন)

বৎসর	দানা শস্য (চাল, গম···)	ডাল
১৯৭০-৭১	৯৬০	১২০
১৯৮০-৮১	১১৯০	১১০
১৯৮১-৮২	১২২০	১১০

চাল, গম প্রভৃতির উৎপাদন-অনুপাত

বৎসর	চাল(%)	গম(%)	অন্যান্য দানা শস্য(%)
১৯৬০-৬১	৫০	১৬	৩৪
১৯৭০-৭১	৪৪	২৫	৩১
১৯৮১-৮২	৪৪	৩১	২৫

ভারতে কৃষিজাত কয়েকটি পণ্যের উৎপাদনের পরিমাণ

বৎসর	১৯৬০-৬১	১৯৭০-৭১	১৯৮০-৮১
খাদ্য শস্য (লক্ষ টনে)	৭৯৭	১০৮৪	১৩০০
তৈলবীজ (,,)	৬৫	৯৩	১০৯
আখ (,,)	১০৪	১২৫	১৮৭
*তুলা (লক্ষ গাঁটে)	৫৪	৪৫	৭৮
** পাট (লক্ষ গাঁটে)	৪০	৪৯	৬৮

* তুলার প্রতি গাঁট=১৭০ কেজি ॥ ** পাটের প্রতি গাঁট=১৮০ কেজি

এখানে ফলের কথাটা উল্লেখ করা সঙ্গত হবে। ফল এক উৎকৃষ্ট, লোভনীয় এবং উপাদেয় খাদ্য। ফলে উপযুক্ত ভাইটামিন, লবণ, এবং অম্ল থাকে। প্রচুর চাহিদার জন্য অনেক দেশে এই শতকে উত্তরোত্তর ফলের চাষ বাড়ছে এবং রপ্তানিও হচ্ছে। খেজুর, কলা, কমলা, আপেল, লেবু, আঙুর, নারকেল, পিচ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দেশের রপ্তানি পণ্য হয়েছে। ভারত থেকে কিছু উৎকৃষ্ট জাতের আম বিদেশে চালান যায়। আমাদের দেশে কলার ফলন খুব বেশী। ১৯৮১-৮২ ভারতে কলা হয়েছে ৪৫ লক্ষ টন। বস্তুতঃ কলার চাষে ভারতের স্থান দ্বিতীয়।

দেশ	ব্রাজিল	ভারত	ইকুয়েডর
কলার উৎপাদন (কোটি পাউন্ডে) (১৯৬৮)	১২০৯	৭৭২	৫৯৪

২। **বস্ত্র :** বস্ত্র প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। রেশম, পশম ও রেয়ন থেকে খানিকটা পরিধেয় তৈরী হয় বটে, তবে অধিকাংশই আসে তুলা থেকে। সেইজন্য পণ্য হিসাবে বস্ত্র শিল্প সর্বত্র যথেষ্ট প্রসারিত। বিভিন্ন দেশের তুলা-উৎপাদনের পরিমাণ আগেই বলা হয়েছে। প্রায় সবটা কাপড়ই মিলে তৈরী হয়। আমাদের দেশে অবশ্য খানিকটা বস্ত্র হস্তচালিত তাঁতে তৈরী হয়।

বস্ত্র শিল্পে বহু লোক নিয়োজিত, শুধু বস্ত্র-উৎপাদনে নয় জামা কাপড় পরিধেয় তৈরীর জন্যও অনেক লোক প্রয়োজন। ১৯৬৭ সালের একটা পরিসংখ্যানে দেখা যায় ঃ—

উৎপন্ন বস্ত্রের মূল্য (কোটি ডলারে)		উৎপন্ন পরিধেয়ের মূল্য (কোটি ডলারে)	
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	৮০০	আঃ যুক্তরাষ্ট্র	১১২৮
রাশিয়া	৪৪৬	রাশিয়া	৪৭৯
জাপান	৩০০	জাপান	৬৭
জার্মানী	১৮০	জার্মানী	১৪৬
গ্রেট-ব্রিটেন	১৬৩	গ্রেট-ব্রিটেন	১০৩

সারা পৃথিবীতে প্রাকৃতিক তন্তুজাত বস্ত্র-উৎপাদন ক্ষমতা ঃ
(হাজার মেট্রিক টন এককে)

১৯৮০	১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৩
১৫৬৫১	১৭০২৫	১৬৩১৯	১৬১৮৬

আমাদের দেশে ৬৬১টি কাপড়ের মিলে ১১.৫ লক্ষ লোক কাজ করে। উৎপাদনের পরিমাণ ৭৯৮ কোটি মিটার (১৯৮১-৮২)। এই লোক সংখ্যার মধ্যে যারা পরিধেয় তৈরী করে বা কাপড়ের ব্যবসায় ব্যাপৃত তাদের ধরা হয়নি। এই সব লোকের রুজি-রোজগার নির্ভর করছে তুলার উপরে।

৩। **পাট ঃ** পৃথিবীর অধিকাংশ পাট গাছ জন্মায় ভারতে আর বাংলাদেশে। নেপালেও কিছু পাটের চাষ হয়, আর হয় বর্মা ও থাইল্যান্ডে। অপেক্ষাকৃত সরু এবং সরল পাটগাছ লম্বায় ৮—১০ ফুট। গাছগুলো কেটে নিয়ে জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। পচন শুরু হলে গাছের গা থেকে তন্তু বের করে নেওয়া হয়। এই তন্তুই পাট, দেখতে সাদাটে বা ধূসর বাদামী। চটকলগুলিতে এই তন্তু থেকেই সুতো তৈরী করে চট বোনা হয়। আমাদের দেশে এই চটশিল্প বিশেষ মূল্যবান ; নিজেদের প্রয়োজন ছাড়াও রপ্তানী করে অনেকটা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়।

দু'রকম পাটগাছের চাষ করা হয়। (১) Corcherus Capsularis

এর সাধারণ নাম "তিতা" পাট। এগুলো নীচু জলাভূমিতেই হয়। আঁশগুলো সাদাটে ও উজ্জল। (২) Corchorus olitorius, সাধারণ নাম 'তোসা' পাট। এগুলো উঁচু জমিতে হয়। এর ফলন বেশী, অর্থাৎ বেশী পরিমাণে আঁশ পাওয়া যায়। আঁশগুলো বাদামী এবং অপেক্ষাকৃত শক্ত, সুতো তৈরীর পক্ষে বেশী উপযুক্ত। দুরকম পাট থেকেই চটের কাপড় তৈরী করা হয়।

আমাদের চটকলের সংখ্যা ৬৬ এবং মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকা। এই চটকলগুলিতে শ্রমিক সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। তা ছাড়া অন্ততঃ ৪০ লক্ষ পরিবার পাট চাষে নিযুক্ত রয়েছে।

বস্তা ও ব্যাগ তৈরীর জন্য এবং জ্যাকিংয়ের জন্য চটের বিস্তর চাহিদা। ডাল, চাল, গম, ময়দা, চিনি, গুড়, সিমেন্ট ইত্যাদি পরিবহনে অসংখ্য পাটের বস্তা প্রয়োজন হয়। চেয়ারের গদি তৈরীতে এবং কার্পেটের নীচের লাইনিংয়ের জন্য চট ব্যবহার হচ্ছে।

আরও দুরকম গাছের চাষ হয়, নাম Hibiscus cannabinus এবং Hibiscus sabdariffa. এদের বলা হয়, "মেস্তা পাট"। মেস্তার গাছ থেকে যে আঁশ বের করা হয়, সেটা চট তৈরীর সময় তোসা ও তিতা পাটের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে বিভিন্ন পাটের উৎপাদনের পরিমাণ হল :-

ভারতের পাট উৎপাদন (হাজার গাঁটে)

[এক গাঁট=১৮০ কেজি]

বৎসর	পাট	মেস্তা
১৯৮০-৮১	৬৫০৭·৯	১৬৫১·৭
১৯৮১-৮২	৬৮১৬·৭	১৫৮৩·০

১৯৮১-৮২-তে চট ও বস্তার রপ্তানির পরিমাণ ৪০০০০০ টন। আঃ যুক্তরাষ্ট্রেই বেশী রপ্তানী হয়। সম্প্রতি একটি চুক্তিও হয়েছে যাতে অদূর ভবিষ্যতে রাশিয়াতে যথেষ্ট চট রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে।

৪। **কাঠ :** বাড়ীঘর, আসবাবপত্র, নিত্যপ্রয়োজনের নানা জিনিষ তৈরীর জন্য কাঠ প্রয়োজন। জ্বালানির কাঠও দরকার। এই কারণে কাঠের শিল্প-ব্যবসায়ের গুরুত্ব সমধিক। অরণ্য-অঞ্চল ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে অথচ

চাহিদা ক্রমবর্ধমান ; তাই আজকাল কাঠ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হয়ে পড়েছে। জঙ্গল থেকে কাঠ নিয়ে আসা, মিলে চেরাই করে কাঠ কাটানো, তারপর সেই কাঠ থেকে কারিগরের সাহায্যে প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করা—এই বিভিন্ন স্তরে নানা ধরনের লোক নিযুক্ত। অনেক পরিবার এই ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করে।

৫। **চিনি :** বীট এবং আখের চাষ চিনি উৎপাদনের জন্য। কোন কোন দেশে যেমন কিউবাতে এটি একটি প্রধান পণ্যশিল্প। চিনি উৎপাদক দেশ হল রাশিয়া, আঃ যুক্তরাষ্ট্র, কিউবা, ইত্যাদি। ১৯৬৯ সনে কয়েকটি দেশের চিনি-উৎপাদন তুলনা করা যেতে পারে।

দেশ	চিনি-উৎপাদন (লক্ষ টনে)	দেশ	চিনি-উৎপাদন (লক্ষ টনে)
রাশিয়া	১১১	ব্রাজিল	৪৮
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	৫৯	ভারতবর্ষ	৪৬
কিউবা	৫২	অস্ট্রেলিয়া	২৯

ইতিমধ্যে আমাদের দেশের চিনি উৎপাদনের উন্নতি হয়েছে। আমাদের উৎপাদনের পরিমাণ ঃ—

বৎসর	১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২
চিনি-উৎপাদন (লক্ষ টনে)	৫৯	৩৯	৫১	৮৪

এদেশে আখের চাষ প্রধানতঃ হয় উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, কর্ণাটক ও অন্ধ্র। মোট তিন লক্ষ লোক সুগার মিলে কাজ করে আর আড়াই কোটি লোক আখের চাষে নিরত। চিনি উৎপাদনের সঙ্গে আরও শিল্প জড়িত। গুড় থেকে ফারমেনটেসন করে অ্যালকোহল বা স্পিরিট তৈরী হয়। আবার লজেন্স, সিরাপ ও অনেক পানীয়ের প্রস্তুতিও চিনির উপর নির্ভর করে। অতএব কত লোকের জীবনযাত্রা এই শিল্পটির সহায়।

স্টার্চ বা চিনি বিশেষ এনজাইমের দ্বারা আক্রান্ত হলে ওগুলো গ্লুকোজে পরিণত হয়। এই গ্লুকোজ উৎসেচন-ক্রিয়ার (fermentation) ফলে অ্যালকোহলে রূপান্তরিত হয়। গুড়, আলু, ভুট্টা, চাল প্রভৃতি থেকে

এভাবে উৎসেচন করে অ্যালকোহল তৈরী হয়। অ্যালকোহলের চাহিদা প্রচুর। যে মেথিলেটেড স্পিরিট সর্বদা বার্নিশে ব্যবহার হয় সেটা সামান্য মিথানল মিশ্রিত এই অ্যালকোহল। একটি অন্যতম প্রয়োজনীয় দ্রাবকরূপে অ্যালকোহল ব্যবহৃত হয়; বিশেষতঃ রেয়ন-শিল্পে। এছাড়া নানারকম জৈব পদার্থ যথা, আয়ডোফর্ম, ক্লোরোফর্ম, ইথার, সুগন্ধী এস্টার প্রভৃতি তৈরী করতে অ্যালকোহল দরকার। মোটরের জ্বালানির সঙ্গেও আজকাল অ্যালকোহল মেশান হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এই সব কারণে অ্যালকোহল উৎপাদন একটি বড় শিল্পে পরিণত হয়েছে।

৬। সুরা: প্রতীচ্যের দেশগুলিতে, বিশেষতঃ শীতপ্রধান দেশে, মদ একটি সাধারণ পানীয়রূপে সর্বত্র গৃহীত। সুতরাং শিল্প জগতে মদ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সুরার সঙ্গে মানুষের পরিচয় সেই প্রাচীনকাল থেকেই। ব্যবলনীয় এবং মিশরীয় সভ্যতার কালে মদের প্রচলন ছিল। হোমার, প্লিনি মদের অশেষ গুণ বর্ণনা করেছেন। ওমর খৈয়াম ত দ্রাক্ষারসের পেয়ালাকে অমর করে রেখে গেছেন, সেক্সপীয়ারও মদের প্রশংসা করেছেন।

বর্তমানে উৎকৃষ্ট সুরা তৈরী হয় দ্রাক্ষারস থেকে। কিছু কিছু মদ আপেল, কালোজাম, চেরি ফলের রস থেকেও হয়। যে সব দেশ উৎকৃষ্ট মদ তৈরী করার জন্য বিখ্যাত সেগুলি হল: ইটালী, স্পেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, অ্যালজেরিয়া, আর্জেন্টিনা। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়াতেও ভাল মদ তৈরী হয়। বিখ্যাত সুরাগুলোর নাম ক্লারেট, বারগেন্ডি, সিয়াঁতি, শ্যাম্পেন, শেরী, ভারমথ ইত্যাদি।

আবার ভুট্টা, বার্লি, গম, চাল, আলু ইত্যাদির ফারমেনটেসনের ফলে যে অ্যালকোহল হয় সেটা চোলাই করে সাধারণ মদ প্রস্তুত হয়। এগুলোতে অ্যালকোহলের পরিমাণ বেশী থাকে এবং অন্যান্য জিনিষও কিছু মেশান হয়। বিয়ার, হুইস্কি, রাম, ভোদ্‌কা, জিন প্রভৃতি মদ প্রচুর প্রস্তুত হয়।

৭। চা ও কফি: সারা বিশ্বে এই দুইটি পানীয়ের প্রচুর চাহিদা। চা-গাছ সাধারণতঃ ৩০০০ ফিট থেকে ৭০০০ ফিট উচ্চতায় অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে জন্মায়। দুইটি কচিপাতা সহ একটি কুঁড়ি গাছ থেকে তুলে নিয়ে শুকিয়ে চায়ের পাতা সংগ্রহ করা হয়। ভারতবর্ষে ও সিংহলে সব চেয়ে বেশী চা জন্মায়। কফি সংগ্রহ হয় গাছের থোকা থোকা ফলের বীজ থেকে।

কফি গাছ বেশী জন্মায় ব্রাজিল, কলম্বিয়া, মধ্য আফ্রিকা, মধ্য আমেরিকার দেশগুলিতে। বর্তমানে জাভা, সুমাত্রা, ভারতবর্ষ, হাওয়াই, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশেও যথেষ্ট কফি উৎপন্ন করা হচ্ছে।

খৃষ্ট জন্মেরও অনেক পূর্বেই চীনে চা আবিষ্কৃত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে জাপানে পানীয় হিসাবে চায়ের প্রচলন হয়। ষোড়শ শতকে চা ইউরোপের বাজারে প্রবেশ করে। তারপর চা পৃথিবীর সর্বত্র এক উত্তম পানীয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে ব্রিটেনই সর্বাধিক পরিমাণ চা আমদানী করে, প্রায় পাঁচ হাজার লক্ষ পাউন্ড। ১৯৮১-৮২ তে সারা পৃথিবীতে চায়ের মোট উৎপাদন ১,৯৫০,০০০ টন তার মধ্যে ভারতের পরিমাণ ৫৬,৪০০ টন।

কফি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ইথিওপিয়াতে। মাঠে চরতে গিয়ে যে সব ছাগল, ভেড়া কফিপাতা বা ফল খেত সেগুলো আর ঘুমাত না। এটা দেখে প্রথমে কফি ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে কফি আরব দেশে আসে এবং সেখান থেকে তুরস্ক ও ইটালীর মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে পানীয়রূপে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে পৃথিবীর মোট উৎপন্ন কফির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র নেয়। বিভিন্ন দেশের চা এবং কফির উৎপাদনের পরিমান (১৯৬৯-৭০) নীচের তালিকা থেকে তুলনা করা যাবে।

চা-এর উৎপাদন (লক্ষ পাউন্ড)		কফির উৎপাদন (লক্ষ পাউন্ড)	
দেশ	উৎপাদন	দেশ	উৎপাদন
ভারতবর্ষ	৮৭৩৪	ব্রাজিল	২৫১৩০
সিংহল	৪৮৪২	কলম্বিয়া	১০৫৮০
চীন	৩৫০৫	আইভরিকোস্ট	৫৬৯০
জাপান	১৯৭৫	অ্যাঙ্গোলা	৪৩৭০
রাশিয়া	১২৭০	মেক্সিকো	৪১০০
ইন্দোনেশিয়া	৮৮৯	উগান্ডা	৩৬৪০

ভারতে ১৯৮২-তে মোট চায়ের উৎপাদনের পরিমাণ ৫,৬৪০ কেজি এবং তার মধ্যে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১,৮৬০ কেজি।

স্থিতিস্থাপকতা বিশেষ থাকে না। ১৮৩৯ সনে চার্লস গুডইয়ার আবিষ্কার করলেন, গলিত সালফারের সঙ্গে রবার উত্তপ্ত করে নিলে, রবারের অনেক উন্নতি হয়, স্থিতিস্থাপকতা বাড়ে, নানা অবস্থায় ও নানা আকারে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সালফারযুক্ত রবারকে বলা হয় "ভালকানাইজড রবার" (vulcanized rubber)। রোমানদের অগ্নিদেবতার নাম 'ভালকান', সেই জন্য এই নামকরণ। বর্তমানে সর্বদাই এই ভালকানাইজড রবার সর্বত্র ব্যবহার হয়।

রবার গাছের আবাদ সর্বাধিক হয় মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলেও কিছু রবারের বাগিচা আছে। ১৯৬৯-৭০ এর প্রাকৃতিক রবারের উৎপাদন (হাজার টনে):—

	মালয়েশিয়া	ইন্দোনেশিয়া	থাইল্যাণ্ড	সিংহল	ভারতবর্ষ
উৎপাদন	১৪১০	৮১৬	৩১১	১৬৬	৮৮

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪২-এ জাপান এই সমস্ত রবার উৎপাদন অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিল। রবার ছাড়া যুদ্ধ চালান অসম্ভব। রাতারাতি আমেরিকান বিজ্ঞানীরা বিউটাডাইন এবং স্টাইরিন থেকে Buna-S নামক কৃত্রিম রবার তৈরী করেন। তারপর আরও নানারকমের উন্নততর কৃত্রিম রবার প্রস্তুত হয়েছে এবং বর্তমানে প্রাকৃতিক রবারের চেয়ে কৃত্রিম রবারের চাহিদা এবং উৎপাদন অনেক বেশী।

পৃথিবীর রবার উৎপাদন (লক্ষ টনে)

বৎসর	প্রাকৃতিক রবার	কৃত্রিম রবার
১৯৪০	১৫·০	০·৪৮
১৯৫০	২০·৮	৬·৪৩
১৯৬০	২২·২	২২·৩১
১৯৭০	৩১·৫	৬১·৬৬

৯। **তামাক :** তাম্রকূট সেবনের নেশা সারা পৃথিবীব্যাপী, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলে যতই চেঁচান হোক না কেন। তাই সিগার, সিগারেট,

৮। **রবার :** গাড়ীর টায়ার, টিউব, ফুটবল এসব দেখলে কখনও কল্পনা করা যায় না যে এসব উদ্ভিদজাত এবং গাছের কষ থেকে তৈরী। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে একরকম গাছ ছিল যার কান্ডে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঁচড় কেটে দিলে দুগ্ধফেনশুভ্র রস ফোঁটা ফোঁটা করে চুইয়ে বেরিয়ে আসে। এর মধ্যে জলের ভাগ প্রায় ৬৫ শতাংশ। এই উদ্ভিদজাত নির্যাসকে বলা হয় ল্যাটেক্স (latex) বা তরুক্ষীর। পাত্রে রেখে দিলে জলটা উবে যায় আর পড়ে থাকে একটা অর্ধশক্ত কঠিনাকার পদার্থ। সেখানকার অধিবাসীরা ঐ গাছকে বলত কেহুচু (cahuchu) এবং ওদের ছেলেমেয়েরা ঐ জিনিষ দিয়ে বল বানিয়ে খেলা করত। এই জিনিষটির অনেক অদ্ভুত গুণ লক্ষ্য করা গেল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, এটা দিয়ে ঘষে ফেললে পেন্সিলের দাগ উঠে যায়। এইজন্য ইংরেজ বিজ্ঞানী যোসেফ প্রিস্টলী এর নাম দেন 'রবার'। সেই থেকে ঐ গাছের নাম 'রবার গাছ'। যদিও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের নামকরণ Hevea brasiliensis. রবার একরকম হাইড্রোকার্বন এবং এর বিশেষ গুণ হল এটি অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক (elastic), টেনে ধরলে লম্বা হয়ে যায় আবার ছেড়ে দিলে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এর ভেতর থেকে বাতাস বেরিয়ে আসতে পারে না। জল এর ভেতরে প্রবেশ করে না। বিদ্যুৎ এর ভেতর দিয়ে যেতে পারে না ; চাপ দিলে সাময়িক বেঁকে যায় আবার চাপ তুলে নিলেই আগের আকারে ফিরে আসে। ফলে অনেক ব্যাপারে রবারের ব্যবহার অপরিহার্য। আমরা বাড়ী তৈরীতে ইট, পাথর, কাঠ, কংক্রীট, কাচ ইত্যাদি যে কোনটি ব্যবহার করতে পারি। পরিধেয়ের জন্য আমরা বস্ত্র, রেশম, পশম, রেয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিষ দিয়ে তৈরী করতে পারি। কিন্তু গাড়ীর টায়ার, টিউব ইত্যাদির জন্য রবার ছাড়া কোন উপায় নেই। বস্তুতঃ উৎপন্ন রবারের অধিকাংশই বাস, ট্রাক, মোটরকার, সাইকেল, এরোপ্লেন, ট্রাকটার প্রভৃতির চাকার জন্য ব্যবহার হয়। এসব ছাড়াও আরও নানা জিনিষে রবার ব্যবহার করা হয়। ফুটবল, টেনিস বল, গল্‌ফ বল, সাতারুর ও ডুবুরীর পোষাক, রেনকোট, প্লাভস, রবার ব্যান্ড, পাপোষ, চেয়ারের ও বিছানার গদি, নল, বৈদ্যুতিক তারের আবরণ, আরও অসংখ্য যন্ত্রপাতিতে রবার প্রয়োজন হয়। মোট ৪০,০০০-এরও বেশী রকমের বস্তুতে বর্তমানে রবার প্রয়োজন হয়।

ল্যাটেক্স থেকে যে রবার উদ্ধার করা হয় সেটা গরমের সময় আঠাল ও নরম হয়ে পড়ে আবার অত্যধিক শীতে কুঁকড়ে যায় ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে ;

বিড়ি, তামাকের ব্যবসায় প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করা হয়। শুধু আঃ যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতিবছরে ৫২৫,০০০,০০০,০০০ সিগারেট খাওয়া হয়; প্রতি দিনের সিগারেটের খরচা ২ কোটি ডলার। আমাদের দেশে আবার তামাক পাতা কুচিয়ে রাবগুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে 'তামাক' তৈরী হয়; হুকো-কলকের সাহায্যে ধূমপানের ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেশে বেশ অনেকটা ভাল তামাকপাতা হয়। ১৯৮২-তে সারা পৃথিবীতে তামাক পাতার উৎপাদন ৬,৮২৬,০০০ টন, তার মধ্যে ভারতের উৎপাদন ৫২৫,০০০ টন, অর্থাৎ ৭·৭ শতাংশ। বিভিন্ন দেশের উৎপাদনের তুলনা করা যেতে পারে ঃ—

তামাকপাতার উৎপাদন (১৯৬৯)

দেশ	উৎপাদন (টনে)	দেশ	উৎপাদন টনে)
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	৯০০,০০	পাকিস্তান	২০০,০০০
চীন	৭০০,০০	জাপান	১৯৫,০৩০
ভারতবর্ষ	৩৮৩,০০	তুরস্ক	১৬১,০০০
ব্রাজিল	২০৫,০০	কানাডা	১১৯,০০০

নেশা ও বিলাসের জন্য এর চেয়ে বড় শিল্পায়ন আর নেই। আর এই বিরাট আয়োজন নির্ভর করছে একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদের উপরে।

উদ্ভিদজাত পদার্থ আরও অনেক বড় বড় শিল্পের মূলে রয়েছে। যেমন, ভোজ্য তেল, বাদাম তেল, তিল তেল, সরষের তেল, নারকেল তেল ইত্যাদির মিল সবদেশেরই এক বড় শিল্প। আবার কার্পাসবীজ তেল, এবং কোন কোন পাম-অয়েলকে হাইড্রোজেন দ্বারা নিষিক্ত করে বনস্পতি ঘি জাতীয় ভোজ্য তেলে পরিণত করা হয়। একে বলা হয় hydrogenation of oils. এই বনস্পতি-উৎপাদন ব্যবসাও এখন যথেষ্ট বড় শিল্প। তিসির তেল দরজা, জানালা, ও কাঠের ও লোহার জিনিস রঙ করতে লাগে। এর প্রচুর চাহিদা, তাই এর জন্য বড় বড় শিল্প গড়ে উঠেছে। তৈলবীজ থেকে তেল নিষ্কাশনের পর যে খোল পড়ে থাকে, সেটা গরু-মোষের খাদ্য হিসাবে খুবই মূল্যবান। তেমনি দানাশস্য বা ডাল বের করে নিলে যে খোসা আর ক্ষুদকুঁড়ো বা ভুসি থাকে সেটাও পশুখাদ্য হিসাবে বিক্রি হয়। এসব ব্যবসাই কোন না কোন উদ্ভিদ থেকে চলে।

এছাড়াও আরও অসংখ্য প্রয়োজনের জিনিষ আমরা উদ্ভিদ-জগৎ থেকে

পাই। সব উল্লেখ করা সম্ভব নয়। সমুদ্র-উদ্ভিদের ভস্ম থেকে আয়োডিন উদ্ধার করা হয়। গুড় এবং অ্যালকোহলের (দুটিই উদ্ভিদ থেকে পাওয়া) উপর ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়ার ফলে ভিনিগার বা অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরী হয়। সাইট্রিক অ্যাসিডের জন্য লেবুর রস, টারটারিক অ্যাসিডের জন্য তেঁতুল প্রায়ই ব্যবহার হয়।

প্রসাধন-দ্রব্য যেমন পাউডার, স্নো, ক্রীম, মাথার তেল, সাবান, টুথপেস্ট ইত্যাদি এবং খাবারের জিনিষ যেমন, সন্দেশ, মিষ্টান্ন, কেক প্রভৃতি সুগন্ধ করার জন্য গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করা হয় তার অনেকটাই উদ্ভিদের দান। ফুলের সৌরভ তার পাপড়িতে কোন উদ্বায়ী তেল (essential oil) থাকার জন্য। গোলাপ, জুঁই, বকুল, হেনা, চাঁপা, এরকম অনেক ফুলের পাপড়িতে সুগন্ধ তেল সামান্য পরিমাণে থাকে। দ্রাবকের সাহায্যে বা স্টীম পাতন করে এই তেল নিষ্কাশিত করে আনা হয়। এই নির্য্যাসের কোহলীয় দ্রবনই বাজারের এসেন্স বা সেন্ট। গোলাপজলও গোলাপের পাপড়ির স্টীম পাতন করে তৈরী হয়। ফুল ছাড়াও গাছের কাঠ, পাতা, বাকল, ফল ইত্যাদি থেকে অনেক সময় এরকম তেল পাওয়া যায়, যথা, চন্দন তেল, ইউকেলিপ্টাস তেল, দারুচিনির তেল, লবঙ্গের তেল ইত্যাদি। জাপান, চীন, ফরমোজাতে কর্পূর গাছ থেকে উদ্বায়ী কর্পূর তৈরী হয়। আজকাল অবশ্য রাসায়নিক পদ্ধতিতে নানা রকম সস্তা কৃত্রিম সুগন্ধ তৈরী হচ্ছে।

নারকেলের উপরের ছোবড়া বা আঁশ বেছে গুছি করে নিয়ে দড়ি পাকানো হয়। বাড়ী তৈরী করার সময় প্রচুর নারকেলের শক্ত দড়ির প্রয়োজন হয়। নৌকো ও জাহাজ বাঁধবার দড়িও ছোবড়া থেকে তৈরী হয়। সস্তা পাপোষ, সিঁড়ির জন্য কার্পেট, মাদুরও এই থেকে তৈরী। আমাদের দেশে কেরালাতে এটি একটি বিশেষ শিল্প।

পাটি, মাদুর, ঝুড়ি, বাস্কেট, ডালা, কুলো, এসব কুটির-শিল্পের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। এগুলো পুরোপুরিই উদ্ভিদ-নির্ভর। ফল থেকে জ্যাম, জেলি, আচার ইত্যাদিও আজকাল উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে।

শিল্পজগতে উদ্ভিদের অবদান সার্বত্রিক।

উদ্ভিদ আমাদের প্রয়োজনের শক্তির যোগানদার

প্রতিদিন শ্যামদূর্বাদল থেকে সুউচ্চ প্রাচীন মহীরুহ পর্যন্ত সব উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষে গ্লুকোজ উৎপাদন করে চলেছে। সালোক-সংশ্লেষের সময় উদ্ভিদের সবুজ পাতা সূর্যরশ্মি থেকে খানিকটা আলোক শক্তি শুষে নেয়। গ্লুকোজে সেই শক্তি বিধৃত হয়ে থাকে। গ্লুকোজের সাহায্যেই আরও বহু জৈব পদার্থ ও খাদ্যবস্তু তৈরী হয়। গ্লুকোজ ও অন্যান্য খাদ্য আমাদের দেহকোষে জারিত হয়ে আমাদের দেহের তাপ এবং কর্মশক্তি যোগায়। এরকম সুষ্ঠু শৃংখলার সঙ্গে উদ্ভিদ শক্তির আদান-প্রদান করে দেয় বলেই আমাদের প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। এর জন্য উদ্ভিদের কাছে আমাদের ঋণের সীমা নেই। কবিগুরু লিখেছেন,

> "ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী
> শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
> যে তেজে ভরিলে মজ্জা মানবেরে তাই করি দান
> করেছ জগৎজয়ী,..."

আবার কলকারখানা চালাতে, যানবাহনের জন্য, বয়লারের জন্য, আরও নানা কাজে আমাদের প্রচুর শক্তির প্রয়োজন। বিদ্যুৎ, পেট্রোলিয়াম, আনবিক চুল্লী প্রভৃতি থেকে যদিও খানিকটা শক্তি পাওয়া যাচ্ছে, তবু এখনও শক্তির জন্য প্রধানতঃ কয়লার উপরেই নির্ভর করতে হয়। এখানেও কিন্তু মূলে উদ্ভিদের অবদান রয়েছে। বহু লক্ষ বছর আগে তখনও পৃথিবীর বুকে আথাল পাথাল উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়া চলছে, কখনও মাটি ফুঁড়ে বিশাল পাহাড় উঠছে, কখনও বিরাট স্থলভূমি গভীর অতলে প্রোথিত হয়ে যাচ্ছে। অনেক ঘন অরণ্য সমাকীর্ণ ভূমি সে সময় নীচে চলে গেছে। তারপর উপরের ভীষণ চাপে আর অভ্যন্তরের প্রচন্ড তাপে সেসব বনজঙ্গলের উদ্ভিদ বিভাজিত হয়ে আস্তে আস্তে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে। সেই সব বন জঙ্গলের তরুলতার কোষে কোষে যে সূর্যরশ্মির শক্তি বিধৃত হয়েছিল, তাই এখন কয়লাতে রাসায়নিক শক্তিরূপে বিরাজ করছে। আজ এত যুগ পরে

সেই কয়লা তুলে আমরা শক্তি সংগ্রহ করছি। এখানেও মূলতঃ উদ্ভিদই শক্তির যোগান দিচ্ছে। কাঠের অন্তর্ধূম পাতনে যেমন কাঠ কয়লা পড়ে থাকে, অনুরূপভাবেই মাটির তলে বনজঙ্গল থেকে কয়লার সৃষ্টি হয়েছে।

* * * * * *

মানুষের সঙ্গে গাছের কিরকম একটা বন্ধন রয়েছে, সেটা ঠিক প্রকাশ করে বলা যায় না। সুদূরে বনরাজির প্রশান্ত শ্যামলিমা মনকে কেমন স্নিগ্ধতায় ভরে দেয়। তরুলতার বর্ণবৈচিত্রময় ফুলের অর্ঘ মনের মধ্যে এক মুগ্ধ আনন্দ ছড়িয়ে দেয়। শরতের শিউলীর সৌরভে, হেমন্তের কচি নিমপাতার দোলায়, 'স্বর্ণশীর্ষ আনমিত' ধানের ক্ষেতের হিল্লোলিত তরঙ্গে অন্তর উল্লাসে ভরে ওঠে। কত গ্রামপ্রান্তে দেখেছি, বিশাল এক মহীরূহ তার অসংখ্য শাখা প্রশাখা প্রসারিত করে মহাযোগীর মত দাঁড়িয়ে আছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তার ঘন শ্যামছায়া। ক্ষেতের কাজ করতে করতে খরতপ্ত মধ্যাহ্নে ঘর্মক্লান্ত চাষী এসে গাছের তলায় বিশ্রাম নেয়, শ্রান্তি অপনোদন করে। দূর গ্রাম থেকে চাষী-বউ খাবার বয়ে নিয়ে এসে স্বামীকে যত্ন করে খাওয়ায়। তারপর বাসনপত্র নিয়ে বউটি ক্ষেতের আল ধরে ধরে নিজের ঘরে ফিরে যায়। এক ছিলিম তামাক খেয়ে চাষী গামছাটি পেতে গাছের তলায় খানিক শুয়ে থাকে। আবার অপরাহ্নে ক্ষেতের কাজ রয়েছে। গাছের স্নিগ্ধ ছায়া তাকে আরাম দেয়, বিশ্রাম-সুখ দেয়। ২০-২৫ বছর আগে এই চাষীর বাবা এবং তারও অনেক আগে এর ঠাকুর্দা দুপুর রোদে এমনি তেতে পুড়ে এসে এই বৃক্ষের ছায়াতেই বিশ্রাম নিত। এই নিস্তব্ধ গম্ভীর মহীরুহ যুগ যুগ ধরে কতজনকে শান্তি জুগিয়েছে, কত পুরুষের কত সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনেছে, কত হাসি-কান্নার সে নীরব সাক্ষী।

আমরা বেঁচে আছি উদ্ভিদের করুণায়। উদ্ভিদ আমাদের খাদ্য যোগায়, উদ্ভিদের কাছ থেকে আমাদের পরিধেয় পাই, উদ্ভিদ আমাদের আবাস-নির্মাণে সাহায্য করে। আমাদের প্রতিদিনের গৃহকাজে প্রয়োজনের ছোটখাট কত জিনিষ উদ্ভিদ নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে দিয়ে যায়, কত পণ্যের সংস্থান করে। প্রতিদানে তার কোন দাবী নেই।

বৃক্ষ তরুলতা আছে, তাই এ পৃথিবী এত সুন্দর ; রসঘন সৌম্য শ্যামলিমায় অপরূপা। তাই বেঁচে থাকার আনন্দ ; তা না হলে রুক্ষ

মরুভূমিতে জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠত। গুরুদেব তার অনবদ্য ভাষায় বলেছেন,

"সন্তরি সমুদ্র উর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়,
দুরন্ত শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয় আখ্যানলিপি লিখি দিলে পল্লব-অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ ;"

অরণ্য, বৃক্ষ, তরুলতা, তৃণদল লহ নমস্কার।

—:: 0 ::—

